অরূপরতন ভট্টাচ

রম্য গণিত



রম্য গণিত

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৮৫

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
শ্রীগৌতম রায়

মুদ্রক
শ্রীদিলীপকুমার দে
দে প্রিন্টার্স
১৫৭বি, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ছয় টাকা

নিবেদন

গণিতকে আমরা সাধারণ মানুষে একটি দুরূহ, ভীতিপ্রদ বিষয় হিসেবে সম্ভ্রম করি, তার থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখি।

কিন্তু গণিত-চর্চা মাত্রই জটিল নয়। তার মধ্যে অনেক রম্যতা আছে যা আমাদের মনকে নাড়া দেয়, ভাবায় অথচ ক্লান্ত বা বিষণ্ণ করে তোলে না।

রম্য গণিত এই ধরণের একটি বই। বাংলায় এই রকম বই ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিনি। এ বই সব বয়সের পাঠকের জন্যে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আনন্দমোহন কলেজ
কলকাতা ৭০০ ০০৯
মহালয়া, ১৩৮৫

অমিতাভ চৌধুরী
যুগান্তর বার্তা সম্পাদক
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত)
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরি
আকাশ চেনো
আমরা কেন আমাদের মত দেখতে
বিজ্ঞানীর দপ্তর
গল্পে গল্পে বিজ্ঞান

লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ

একেবারে অসম্ভব এমন কথা বলি না, কিন্তু এ কথা ঠিক যে লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ, সে অনেকটা সাত রাজার ধন এক মাণিকের মত — অর্থগৌরবেও বটে, তাছাড়া সহজে সে লভ্য নয়, সে কারণেও, সন্দেহ নেই।

পয়সা নিয়ে হেড-টেল —লটারিরর ক্ষেত্রে সেই প্রাথমিক অবলম্বন, সার্বজনীনতার পর্যায়ভুক্ত। খেলার মাঠে পতৌদির নবাব আর গারফিল্ড সোবার্স, কে জিতবে, কে হারবে? এই আধুলি। হয় অশোকস্তম্ভ, নয় রূপেয়া কা আধা ভাগ। দুটো পিঠ, তার একটা, দুভাগের এক ভাগ, হেডের বেলাও যতটা, টেলের বেলাতেও তাই — ফলে প্রাপ্তিযোগ ফিফটি-ফিফটি। সম্ভাবনা সমান সমান।

লটারির সবচেয়ে বড় কথা হল, এই প্রাপ্তিযোগের সমান সম্ভাবনা —সেখানে হরিজন নেই, মহাজন নেই, সেখানে রাজা নেই, ফকির সেই, সেখানে ধনী-নির্ধন নেই, লটারির টিকিটের প্রাপ্তি জাত-হীন, গোত্রহীন, কূলহীন, আপিসের প্রোমোশন লিস্টের মত এখানে এফিসিয়েন্সি লাগে না, মেরিটের প্রয়োজন নেই, সুপারিশ, তদ্বির, তদারকের প্রয়োজন পড়ে না, তাই লটারিতে সকলের সমান উৎসাহ, তাই সে সার্বজনীনতার পর্যায়ভুক্ত।

লুডো খেলাও লটারির মতন — পয়সা নিয়ে হেড-টেলের সে একটা উন্নত সংস্করণ। দিদিমা-ঠাকুমারা যখন নাতি-নাতনীর সঙ্গে লুডো খেলতে বসে ছোটদের হারিয়ে দেন, আর পান চিবোনো হাসি মুখে বলেন, বুঝলে ভায়া, খেলতে জানা চাই, তখন সে কথা স্বীকার না করার বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

হেড-টেলে দুটো সম্ভাবনা, লুডো খেলায় ছক্কার ছ'টা পিঠ, এক

থেকে ছয়, কাজেই সেখানে ছটি সম্ভাবনা। দুটো সম্ভাবনায় দুবার টস করি —হেড পড়বার কথা একবার, টেল অন্যবার। সম্ভাবনা, কাজেই গাণিতিক দিক দিয়ে সত্য, এমন কথা বলি না, কিন্তু দুবার টস করার বদলে পঞ্চাশে আসি, একশোয় উঠি, যতই টসের পরিমাণ বাড়াব, ততই বক্তব্যের যাথার্থ্য বুঝতে পারব। তাই টসের পরিমাণ এক লক্ষ করলে হেড-টেল দুই-ই সংখ্যায় পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। লুডোর ছক্কার ছটা পিঠেও, এক থেকে ছয় পর্যন্ত এক একটা সংখ্যা। কাজেই ছটা সম্ভাবনা সবশুদ্ধ। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। সেই ছটা সম্ভাবনার মধ্যে এক পড়বার সম্ভাবনা ১/৬। দু'য়ের বেলাও তাই। তিন চার পাঁচ ছয়ের পরিমাণও সেই ১/৬। সেই জন্যে ছ'বার লুডোর গুটি চাললে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সব ঘরের চাল একবার করে পাব, গাণিতিক দিক দিয়ে এমন কথা বলতে পারি। তাই লুডোর সর্ববৃহৎ চাল, ছয় পাওয়ার ভাগ্য দিদিমা-নাতি সকলেরই সমান — সেখানে বঞ্চনার প্রশ্ন ওঠে না।

হেড-টেল বা লুডোও লটারির পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু লটারি বলতে আমরা বিশেষভাবে বুঝি, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রবর্তিত ভাগ্য গণনার আধুনিক প্রক্রিয়া। এক একটা লটারি, যেখানে ফার্ষ্ট প্রাইজের পরিমাণ লক্ষ টাকার উপরে, সেখানে টিকিট বিক্রয়ের সংখ্যা দশ লক্ষ ধরে নিতে পারি। তার মধ্যে ফার্স্ট প্রাইজ সবাই আশা করেন। শিকে ছেঁড়ে কেবল একজনের ভাগ্যে। লুডো বা হেড-টেলের মত সে সম্ভাবনা তাই ১/১০০০০০০-র বেশি নয়।

লটারি —এ কালের উন্নত গাণিতিক সম্ভাবনাবাদের একটা রূপান্তর মাত্র। মৃত্যু এবং ট্যাক্সের বোঝা ছাড়া মানব জীবনের সর্বত্রই অনিশ্চয়তা। সেই অনিশ্চিয়তাকে গাণিতিক দিক দিয়ে সংহত করবার চেষ্টা হল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যম পর্বে। আধুনিক সম্ভাবনাবাদের প্রাথমিক রূপ — পথিকৃৎ যাঁরা, তাঁরা হলেন সেভালিয়র দি মেরে এবং দুজন বিশ্ববন্দিত গাণিতিক, পাসকেল এবং ফারমাট।

তাস-পাশাকে অবলম্বন করেই সম্ভাবনাবাদে তাঁদের প্রথম উৎসাহ। মানব সমাজের এক অবহেলিত দিককে নিয়ে শুরু, কিন্তু আজ গাণিতিক জগতে সে একান্ত অপরিহার্য —অন্তত ব্রহ্মাণ্ডে সে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

মেরে, পাসকেল এবং ফারমাটের সম্ভাবনাবাদ তত্ত্বের পরে সম্ভাবনাবাদ রেখাচিত্র অঙ্কিত হল।

তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বটে কিন্তু সম্ভাবনাবাদের উৎপত্তি হল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। সেভালিয়র দি মেরে ছিলেন জুয়া খেলার এক বড় ওস্তাদ। একবার এক ট্রেনযাত্রায় (১৬৫১ কি ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি পাসকেলের সহযাত্রী ছিলেন। ট্রেনযাত্রায় সহজে সময় কেটে যায় এমন কি প্রসঙ্গ তোলা যায়? মেরে জুয়োখেলার এক ধাঁধার গল্প তুললেন। নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেটি এখানে উত্থাপন করছি।

ক এবং খ এই দুই ব্যক্তি কোনো বাজী জেতার জন্যে একটি খেলা খেলছেন। বাজীতে শর্ত এই যে, যিনি প্রথম তিনটি খেলায় জিতবেন তিনিই বাজীতে জয়ী হবেন। কিন্তু ক দুটি খেলায় জেতার পরে এবং খ একটি খেলায় জেতার পরে অকস্মাৎ খেলা গেল বন্ধ হয়ে। তখন বাজীর অর্থ কিভাবে বিতরণ করা হবে?

মেরে এবং পাসকেলের রেল ভ্রমণে সময় কেমন কেটেছিল বলতে পারব না, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, পাসকেল এই ধাঁধাটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পাসকেল ও ফারমাট দু'জনে মিলে ধাঁধার সমাধান বের করলেন।

তাঁরা বললেন, যদি খ আর-একটি খেলা খেলেন এবং সেটিতে জয়লাভ করেন, তা হলে ক এবং খ বাজীর অর্থ সমানভাবে ভাগ করে নেবেন।

কিন্তু সেই কল্পিত খেলাতে ক-এর জয় হলে বাজীর পুরো টাকা ক-এর। অর্থাৎ যে কোনো ক্ষেত্রেই বাজীর অর্ধেক টাকা ক

পাবেনই —তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। তা হলে সেই প্রথম অর্ধেক ক-এর কাছে থাক। বাকী অর্ধেকটা নিয়েই বিতর্ক —কল্পিত খেলা নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

কল্পিত খেলায় ক হারলে দ্বিতীয়ার্ধ খ পাবেন কিংবা ক জিতলে তিনটি খেলায় জয়লাভের জন্যে দ্বিতীয়ার্ধও ক পাবেন। অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধও ক এবং খ-র পাবার সমান সম্ভাবনা। সুতরাং দ্বিতীয়ার্ধও ক এবং খ-এর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া বিধেয়। তাহলে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ক-এর প্রাপ্তি ১/৪, খ-এরও সেই ১/৪। এবং সব জড়িয়ে ক ৩/৪, খ ১/৪।

তাঁরা এই সমাধানকে আরও ভিন্ন ভাবে পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। আসল কথা এই যে, এই ধাঁধার ভেতর দিয়েই সম্ভাবনাবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল।

কিন্তু জুয়ার আসরে এই সম্ভাবনাবাদ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ততটা পরস্পরকে ভরসা দেয় না।



সপ্তদশ শতাব্দীর সম্ভাবনা সংক্রান্ত এই ধারণার সংস্কার সাধন

করলেন উনবিংশ শতাব্দীতে গাণিতিক কার্ল ফ্রেডরিক গস। তাঁর প্রচেষ্টায় সম্ভাবনার তত্ত্ব নিখুঁত হল এবং বাস্তবের সঙ্গে তত্ত্বের পার্থক্যটুকু ধরা পড়ল।

আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গেও সম্ভাবনাবাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে। সে যোগাযোগ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের Random walk-নীতি প্রসঙ্গে।

পথের প্রান্তে নয়, খোলা জায়গায় মাঠের মাঝখানে একটি ল্যাম্প পোস্ট কল্পনা করা যাক। এই ল্যাপ পোস্টের পাশে একটি ছেলেকে এনে দাঁড় করাই, নিশ্ছিদ্র রুমাল বাঁধি তার চোখে, তারপর সেই ছেলেটিকে আপন খেয়াল খুশি অনুসারে চলাফেরা করার নির্দেশ দিই। ছেলেটি যে পথে চলবে নিঃসন্দেহে সেটি আঁকাবাঁকা হিজিবিজি পথ — তার কোনো জ্যামিতিক চিত্রবৈশিষ্ট্য থাকার কথা নয় তবু Law of disorder অনুসারে সেই খেয়ালী পথেরও একটা চিত্রবৈশিষ্ট্য নজরে আসবে। তাকে বলতে পারি গাণিতিক বে-নিয়মের নিয়ম। সে নিয়মে ঘুরে ফিরে ছেলেটি ল্যাম্প পোস্টের কাছেই এসে পৌঁছোবে।

এই দৃষ্টান্তের মধ্যেই আছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যেমন ইচ্ছা তেমন পথ চলা বা Random Walk principle-এর সঙ্কেত, বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ২৬ বৎসর বয়সের উদ্ভাবন — কোনো তরলের ভাসমান সূক্ষ্ম পদার্থের গতি বৈচিত্র্য নিরূপণে যার ব্যবহার দেখি।

সম্ভাবনার বহু বিচিত্র ক্ষেত্র আছে। বাবা মা যদি দুটি মাত্র সন্তান চান এবং সে দুটি সন্তানের মধ্যে যদি প্রথমটি পুত্র এবং দ্বিতীয়টি কন্যা আশা করেন, তাহলে তার সম্ভাবনা কত?

সবশুদ্ধ সম্ভাবনা কটি? দুটিই পুত্র হতে পারে কিংবা দুটিই কন্যা—এই হল দুই বা প্রথমটি পুত্র দ্বিতীয়টি কন্যা কিংবা প্রথমটি কন্যা, দ্বিতীয়টি পুত্র —এই বাকি দুই। তাহলে এই চারটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটি পুত্র এবং দ্বিতীয়টি কন্যা হবার সম্ভাবনা ১/৪।

ঐ যে একদল মানুষ ওখানে মাঠে বসে জটলা করছেন, কে বলবে, একই দিনে জন্মেছেন এমন দুটি মানুষ ঐ দলে আছে কিনা। দল যত ভারি হবে, ততই জন্মদিন এক হবার সম্ভাবনা বাড়বে আর বছরের দিনের সংখ্যা ৩৬৫ এর উর্দ্ধে ৩৬৬ দিনের সম্মিলনে দু'জনের জন্মদিন সুনিশ্চিতভাবে মিলবে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু গাণিতিকরা বলছেন, ১০, ২০, ৩০, ৪০, জন লোকের বেলাতেও জন্মদিন এক হবারও উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা আছে। সেই কারণেই বিস্ময়। তাঁরা বলছেন, যদি দলে ১০ জন মানুষ থাকেন, তাহলে সম্ভাবনা ১/১০, যদি দল ভারি হয়ে ২৫-এ উন্নীত হয় তাহলে সম্ভাবনা ৫/১০, অর্থাৎ ১/২ বা ৫০% আর যদি ৫০ জনের বেশি একত্রিত হন, তাহলে জন্মদিন এক, এমন দুটি মানুষ পাবার সম্ভাবনা খুব — খুবই বেশী।

গাণিতিকদের বিচিত্র চিন্তাধারার মধ্যে জন্মদিন এক—এই সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন। প্রখ্যাত গাণিতিক ওয়ারেন উইভার একবার ডিনার টেবিলে গল্প গুজবের মাঝ-খানে এই বিষয়টির কথা তুলেছিলেন। টেবিল জুড়ে সব মিলিটারি অফিসার। উইভার গুণে দেখলেন ২২জন — মনে মনে ভাবলেন সম্ভাবনা আছে। উইভার বললেন, আপনারাও আপনাদের জন্ম তারিখ মিলিয়ে দেখতে পারেন।

উৎসাহিত হলেন সকলে। জন্মদিনের তারিখ বলা শুরু হল। এক একজন তারিখ বলেন আর উইভার ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়েন— না, কেউ নেই ; ২২জনঅফিসার — তাঁদের কোনো দুজনেরই জন্মদিন এক নয়। উইভারের নিজের জন্ম তারিখও কারোর সঙ্গে মিলল না।

এই অবস্থায় হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করল পরিবেশনকারী মহিলাটি। দরজায় ঠেস দিয়ে সে সমস্ত বিষয়টি সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করছিল, সকলের যখন বয়স বলা শেষ হল, তখন সে সাহস সঞ্চয় করে একজন

জেনারেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে উইভারকে বলল, ঐ ভদ্রলোকটি যে দিন জন্মেছেন, আমার জন্মও সেইদিনে।

সম্ভাবনা সম্ভাবনাই — তার মধ্যে নিশ্চয়তার কথা নেই, তবু বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আজ সে প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে এসেছে।

সার্বজনীন ধাঁধা

নির্মল আনন্দ দেওয়া ধাঁধার আসল উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই কিন্তু ধাঁধার ভিতর দিয়েই মানুষের বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আর চিন্তার তীক্ষ্ণতাকেও যাচাই করা চলে অনেক সময়ে। ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতিভিত্তিক বা বিভিন্ন বিষয়ের গৌরবে পুষ্ট ধাঁধার দরকার নেই তার জন্যে ; ছোট ছোট ধাঁধা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা, সাধারণের বুদ্ধিপ্রসূত, চিন্তায় পরিপুষ্ট, তাই নিয়েই বুদ্ধির তারতম্যকে স্বচ্ছন্দে বিচার করা চলতে পারে। আর সকল শ্রেণীর ধাঁধার মধ্যে ছোটদের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আছে। এখানে প্রথম ধাঁধাটি অল্পবয়স্কদের জন্য সহজ সরল এই জাতীয় ধাঁধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

শনিবার। দুটোয় ছুটির ঘণ্টা। অত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কিছু করার নেই। এ সময়ে সিনেমা দেখার ইচ্ছে হতে পারে মনের মধ্যে। গোটা দুই ভালো বই হচ্ছিল এসপ্ল্যানেড্ পাড়ার এদিকে ওদিকে। ম্যাটিনী শো, শনিবারের দুপুর, না পাওয়ার আশঙ্কা পুরো বারো আনা। তবু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোনো গেল টিকিট পাওয়ার ভরসা করে। কিন্তু কপাল নেহাৎ খারাপ ছিল বলতে হবে। কম দামী টিকিটের কথাই ওঠে না, উঁচু দরের টিকিটও সব শেষ, হলে পৌঁছোনোর অনেক আগেই।

কী আর করা যায়? মন খারাপ করে বাড়ি ফিরতে হল দুপুর-

বেলা। আর সেই মন খারাপের অবস্থা দেখে বাড়ীর ছোটরা একটা মজার ধাঁধা আওড়াতে পারে এক রকম শুনিয়ে শুনিয়ে, 'কোন্ ফুল দেখলে মন খারাপ হয়?'

না বলতে পারলে আর লজ্জার সীমা নেই। সিনেমা হলের কথা একবার মনে করা যাক। কাউন্টারে গিয়ে টিকিট আছে কি নেই জিজ্ঞেস করার আগেই ঠিক মাথার উপরে নিয়ন লাইটের আলো দেখে থমকে দাঁড়ানোর কথা। সেখানে 'হাউস-ফুল' দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মন খুশীতে উছলে ওঠেনি। অথচ 'হাউস ফুল' দেখে মন খারাপ হবে, বলতে না পারার কারণ কী থাকতে পারে?

টিকিট না পাওয়ার যে দুঃখ, তার বোঝা আরও অনেকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খানিকটা হাল্কা হওয়া গেল। বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে নিয়ে ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়াতে হল অনেকের মত। মনে করি, ট্রামের সামনে দুটো সীট খালি ছিল দুই ভাগ্যবানের জন্য। তার একটায় জায়গাও হল। আর পাশে সীট খালি থাকলে কে বা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে? আর এক ভদ্রলোক এসে বসলেন পুরো সীটটার বাকি অংশটাতে। তখনকার কথা একবার স্মরণ করা যাক। কণ্ডাকটার টিকিট চাইতেই দুজনেই হাত বাড়াল—২৫ পয়সা। তবু কাণ্ডটা দেখবার মত। কণ্ডাকটার একজনকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন। আর অন্যজন, তার সঙ্গে কী কণ্ডাকটারের পরিচয় আছে পূর্ব থেকে? তার কাছ থেকে ২৫টা পয়সা নিলে হাত বাড়িয়ে আর কোথায় যাবেন কিছু না জিজ্ঞেস করে কেন ঠিক টিকিটটি এগিয়ে দিল সহজভাবে?

বাসে ট্রামে যাতায়াত রোজ দুবেলা আফিস আওয়ার্সে; সেখানে এরকম ঘটনা নতুন নয় কারো পক্ষেই। তবু সমাধান খুঁজে দেখা যায় ইচ্ছে হলে। সমাধান বের করবার সময়ে পরিচয়ের সূত্র ধরে এগোতে মন চাইবে প্রথম থেকে। সেটা কাজের কথা নয়। পরিচয়ের

সূত্র ধাঁধাকে বিপথে চালিত করার অস্ত্র মাত্র। তার আকর্ষণ উপেক্ষা করে দৈনন্দিন ট্রাম বাসের টিকিট কাটার সময়ের কথা মনে করতে হবে ; ধাঁধার উত্তর বের করা যায় অল্প আয়াসেই।

ধাঁধার জন্যে আর রাস্তায় নামার দরকার নেই এমনি করে। এবার প্রথম পুরুষ নিয়ে একটি ধাঁধা।

ধরি, একটি লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ৪০ কেজি ওজনের একটি পাথর মাথায় নিয়ে। ভারি পাথর, হঠাৎ হল কী, অসতর্ক মুহূর্তে লোকটার মাথা থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙে চার চারটে টুকরো। তবু কপাল ভালো বলতে হবে। সেই চারটে পাথর নিয়ে এক কেজি থেকে ৪০ কেজি যে কোনো ওজনই বের করা যায় ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে।

৪০ কেজি ওজনের পাথর ভেঙে যে চারটে টুকরো হল তার কোন্‌টার ওজন কত ?

এবারে সহজ সরল শিক্ষামূলক একটি ধাঁধায় আসা যাক। অতি লোভে যে তাঁতী নষ্ট হয় এ ধাঁধাটি থেকে সেটা বোঝা যায়।

ধরা যাক, কোনো রবিবার এক বাগানবাড়িতে বনভোজনের আয়োজন। সেই বাগানবাড়িতে গাছ ভর্তি আম, দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত জাতের সব। পেড়ে খাওয়ার কার না ইচ্ছে হয় ? কিন্তু কয়েক জোড়া সতর্ক দৃষ্টি আছে ; ছটি দ্বারোয়ান, তারা সব সময়ে কড়া নজর রেখেছে। সেখান থেকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কথা নয় কারো পক্ষেই। কাজেই কমিশনের পথ ধরতে হল। যা আম পাড়া হবে তার অর্ধেক পাবে প্রথম দ্বারোয়ান আর সেই দ্বারোয়ানটি তার থেকে একটি আম ফিরিয়ে দেবে। বাকি আম নিয়ে আবার দ্বিতীয় দ্বারোয়ানের শরণাপন্ন হওয়া। প্রথম দ্বারোয়ানের সঙ্গে লেন দেন করে যা রইল আবার তার অর্ধেক পাবে দ্বিতীয় দ্বারোয়ান আর দ্বিতীয় দ্বারোয়ান তার থেকে একটি আম ফিরিয়ে দেবে প্রথম

দ্বারোয়ানের মত। তার পরে বাকি আম নিয়ে তৃতীয় দ্বারোয়ানের সঙ্গে বোঝাপড়া ঠিক আগের মত। এইভাবে ছটি দ্বারোয়ানের হাত ঘুরে বাগান বাড়ির বাইরে বেরোনো। আর মজার কথা এই যে, গাছ থেকে প্রথমে যতগুলো আম পাড়া হয়েছিল ঠিক ততগুলো আম সঙ্গে নিয়ে খুশী মনেই দ্বারোয়ানদের ঠকানো গেল লেনদেনের চুক্তি বজায় রেখে।

বেশী লোভ করে গাছ থেকে অনেক আম পাড়ার দরকার নেই। অতি লোভের ফল ভাল দাঁড়ায় না, তাতে শুধু দ্বারোয়ানদেরই উদর পূর্তি। অল্প আম নিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক। এখন আম খেতে খেতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত একটা ধাঁধার কথা উল্লেখ করি।

মনে করি, কলকাতা শহরে একটা শাড়ির দোকান। খদ্দেরের উপরেই দোকান; কত রকমের লোক আছে, কত রকমের লোক আসে; সব কী আর মুখ দেখে চেনার উপায় থাকে? কোনো একজন লোক এল দোকানে একটি শাড়ি কিনতে। পছন্দমত শাড়ি, তিরিশ টাকা দাম। একশো টাকার একটি নোট এগিয়ে দিল খরিদ্দার। সকালবেলা, সবে দোকান খুলেছে, তখনও খুচরো ছিল না হাতের কাছে। দোকানদার সেই নোট নিয়ে পাশের দোকানে গেল ভাঙানোর জন্যে। দোকানীরা দোকানীর বন্ধু, ভাঙিয়ে নিয়ে ফিরে এল নিজের দোকানে। আর পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পরে খদ্দের যখন বিদায় নিল ধাঁধা সুরু হল তখন থেকে।

পাশের দোকানী দৌড়ে এসে ঢুকল এ দোকানে—ও মশায়, করেছেন কী, একশ টাকার যে নোটটা দিয়েছেন, সেটা একদম জাল।

জাল! এ দোকানী বিস্মিত হল।

পাশের দোকানের দোকানদার বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই দেখুন।

না দেখে উপায় কী, নোট মিলিয়ে দেখা হল। হ্যাঁ, দোকানীর কথাই ঠিক।

কিন্তু তখন আর করবার কিছু নেই, খদ্দের তখন দোকানের

বাইরে আর যে খদ্দের ঠকাতে আসে দোকানের বাইরে বেরিয়ে সে যে কোথায় চলে যায় তখন তাকে কে খুঁজে বের করবে? ক্ষতির দশা, পাশের দোকানদারকে একটা একশো টাকার নোট দিতেই হল জাল নোটের বদলি হিসেবে। খদ্দেরও ঠকিয়ে গেল তার উপরে। দিনের শুরুতে দোকান খুলেই ক্ষতির উপর ক্ষতি। লাভ-ক্ষতির হিসেবই ব্যবসায়ীর দিনরাতের চিন্তা। এখানে লাভের কথাই ওঠে না। আর ব্যবসায়ী হতে গেলে শুধু সঠিক ক্ষতিটুকু বের করবার জন্যে বেশী সময় নেওয়া উচিত হবে না কখনোই।

এবার এ সবের বাইরে বেরিয়ে দেশ পরিভ্রমণের কথা চিন্তা করা যাক। কতবার হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপেছি। গাড়ি ছুটে চলেছে হু হু করে, উল্টোদিক থেকে গাড়ি আসে এক একটা, আর হুস করে পার হয়ে যায় চোখের উপর দিয়ে। সেই গাড়ি পারাপার নিয়ে এই ধাঁধাটি। ট্রেনে চেপে যে কেউ যতদূর ইচ্ছে খেয়াল খুশী মত বেড়িয়ে আসতে পারে, শুধু হাওড়া থেকে আসানসোল, এইটুকুর মধ্যে সচেতন থাকতে হবে ধাঁধার প্রয়োজনে।

ট্রেনের প্রোগ্রাম আমিই করে দিচ্ছি। ধরে নিই, হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। সকাল ছটা থেকে শুরু, তারপরে সাতটার সময়ে একটা, আটটায় আর একটা, এইভাবে চলল, সারাদিন, সারা রাত্তির। আর আসানসোলও একটা জাংশন স্টেশন, আসানসোল থেকেও সেরকম। সকাল ছটা থেকে শুরু, তারপরে এক ঘণ্টা অন্তর সারাদিন, সারারাত্রি। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, হাওড়া থেকে আসানসোলের দূরত্ব কম নয়। কী আপ বা কী ডাউন ট্রেন, প্রতিটি গাড়িরই পৌঁছোতে সময় লাগে ছ'ঘণ্টা। ধরে নিই, হাওড়া থেকে দুপুর বারোটায় যে গাড়ি ছাড়ছে আসানসোল পৌঁছোতে তার সন্ধ্যে ছটা। হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়বার পরে আর আসানসোলে পৌঁছোনোর আগে পথিমধ্যে হাওড়াগামী কতগুলো ট্রেন তা পার হবে?

আর ট্রেনে যেতে যেতে পথের ছ'ধারে খাল বিল পুকুর নিশ্চয় নজরে পড়বে। সেই খাল বিল পুকুরকে নিয়ে সুন্দর ধাঁধা পরিবেশন করা যায়।

সবাই জানি, পুকুরে একবার পানা হ'তে শুরু করলে তাকে সমূলে উচ্ছেদ না করলে দেখতে দেখতে সে সমস্ত পুকুরটিকে ছেয়ে ফেলবে।

মনে করি, আজ যে পরিমাণ পানা আছে পুকুরটিতে কাল সেই পানা তার ডবল হবে। পরশু তারও ডবল। এইভাবে রোজই তার দ্বিগুণ দ্বিগুণ। ধরি, এরকমভাবে পুকুরটাকে ছেয়ে ফেলতে ফেলতে দেখা গেল যে, দশদিনের দিন সম্পূর্ণ পুকুরটার অর্ধেক পানায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সমস্ত পুকুরটা পানায় ভর্তি হ'তে কতদিন সময় লাগবে ?

জন্মদিনকে কেন্দ্র করেও বিচিত্র ধাঁধার প্রচলন আছে। আমাদের অনেকেরই বছরে একবার জন্মদিন কিন্তু সকলেরই যে বছরে একটা করে জন্মদিন আসে, তা নয়। না, বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, সত্তর বছরের দিদিমা তাঁর সতেরো বছরের নাতনীটিকে এমনটি বলতেও পারেন যে, তোর জীবনে যতগুলো জন্মদিন এসেছে, আমার জীবনেও ঠিক ততগুলো জন্মদিন এসেছে।

নাতনিটি মুখ ঘুরিয়ে বলবে, ইস, তাই কখনো হয়! কিন্তু কখনও কখনও যে হয়, লিপ্ ইয়ারই তা প্রমাণ করে দেবে। বছরে ৩৬৫ দিন, লিপ্ ইয়ারে ৩৬৬। ফেব্রুয়ারির সেই উনত্রিশ তারিখে জন্মদিন হ'লে মুস্কিলের কথা। হিসেবে দাঁড়ায় চার বছরে মাত্র একটা জন্মদিন।

গণিতের নানা সংখ্যাকে নিয়ে সুন্দর ধাঁধা রচনা করে চলে। ১০৩, ২০৩ বা ৩০৩-কে উচ্চারণের উপরে নির্ভর করে বলা যায় এক সতীন, দুই সতীন বা তিন সতীন।

আরো অনেক বিচিত্র ধাঁধা আছে দেশে বিদেশে, পৃথিবীর এ প্রান্তে ও প্রান্তে। তারা কখনও ছড়িয়ে পড়ে কথাবার্তায় লোকের

মুখে মুখে, কখনও বা ছড়িয়ে পড়ে সংকলিত বইয়ের পাতার মধ্য দিয়ে।

গুজব রটে গাণিতিক নিয়মে

তেমন যদি কোনো গুজব হয়, তবে কথায় বলে, তা হাওয়ার আগে ছড়িয়ে পড়ে।

কী ভাবে?

মনে করে নিই, আমিই কোনো গুজবের উৎস স্থল। দেশে চলেছি অনেক দিন বাদে। খালি হাতে যাওয়া যায় না। কষ্টে-সৃষ্টে হাতির বাচ্চার মত খান দুই ফুলকপি কিনেছি। বারুইপুরের বেগুনও এক কেজি না কিনে পারলুম না। তা ছাড়া নতুন গুড় উঠেছে বাজারে। গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। সেই গুড়ও নিলাম এক হাঁড়ি সঙ্গে করে। আর নিয়েছি জয়নগরের মোয়া।

গ্রামের রেলস্টেশনে নামতেই, ধরা যাক, চোখাচোখি হয়ে গেল পরিচিত স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে।

কী ব্যাপার! এত জিনিষপত্তর! সমস্ত কলকাতা শুদ্ধ বাজার করে এনেছেন দেখছি।

সহজেই বলা যায়, অনেকদিন বাদে দেশে আসছি। কিন্তু সে কথা না ব'লে মনের জ্বালায় একেবারে অর্থহীন প্রলাপ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। গুজব তো তাকেই বলে।

বলে ফেললাম, ইচ্ছে ছিল আরও আনি দাদা; একা মানুষ, বই কী করে এতো?

স্টেশনমাস্টারের চোখ চক্ চক্ করতে লাগল।

বটে? বটে? প্রমোশন হয়েছে বুঝি চাকরিতে?

নির্লিপ্তভাবেই বলে চললাম, তা হয়েছে ঠিকই, বছর ঘুরতে না

ঘুরতে তিনটে লিফ্‌ট পেলাম। তিনশোয় ঢুকেছিলাম, সাড়ে চারশোয় পৌঁছে গেলাম দেখতে দেখতে।

যে লোকটা কাউন্টারে বসে টিকিট বেচছিল, ঘুরে তাকিয়েছে সে, ফাইলের যোগ বিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে অন্যজনের। সবাই হাঁ করে আমাকে দেখছে।

স্টেশনমাষ্টার খাবি খেতে লাগলেন ঘন ঘন —ইস্‌ দাদা, অনেকদিন ধরে পচছি, একটা ব্যবস্থা করে দিন না কলকাতায়।

আমি অবাক হবার ভান করলাম, সে কি মশায়, ফার্মে ফার্মে ভেকান্সি, অফিসে অফিসে কর্মখালি, চতুর্দিকে লোক চাই ; কাজকর্ম বন্ধ হবার জোগার লোকের অভাবে।

স্টেশনমাস্টার চেয়ার থেকে উল্টোতে উল্টোতে সামলে নিলেন।

আমি আর এক ডিগরি চড়িয়ে দিলাম, কাগজ পড়ছেন না আজকাল? সবাই কলকাতায় ছুটেছে, ডাউন ট্রেনে কী রকম ভীড় যাচ্ছে, দেখছেন না?

ঘরের পাঁচজন কর্মচারীই আপনার পাশে উঠে এসেছে। তারা বললে, তারপর, তারপর?

এতো গেল চাকরি-বাকরির কথা, বাজারের অবস্থা আরো ভাল। সেখানে খুচরো কেনাই মুসকিল, একা আমি, কত আর খাওয়া যায়। দু' কিলো কাশীর বেগুন কুড়ি পয়সা। আলু পনেরো পয়সা কিলো। তিন কিলো খাঁটি সরষের তেল পঞ্চাশ পয়সা।

যাতায়াতের অসুবিধে নেই কিছু। অঢেল বাস-ট্রাম, ভাড়া দিন দিন কমছে, ট্যাক্সির ছড়াছড়ি রাস্তায়, পাঁচ মাইল পঞ্চাশ পয়সা।

স্টেশনমাস্টার বললেন, বলে যান, বলে যান।

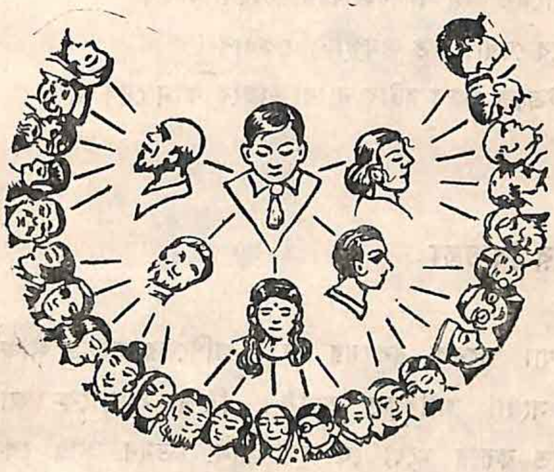
কত আর বলব? যে কোনো সময়ে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছোলেই হল। অজস্র বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে, চতুর্দিকে টু-লেট, টু-লেট।

ভাড়াও তেমনি সস্তা। পছন্দ মত যে কোনো বাড়িতে উঠে যতদিন ইচ্ছে কাটিয়ে আসতে পারেন।

এগারোটা বাজতেই বাকি পাঁচজনের ডিউটি শেষ। চলে গেল তারা। স্টেশনমাস্টার কিছুতেই উঠতে দিলেন না।

আর সাড়ে বারোটায় আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন দেখলাম বাড়িশুদ্ধ, বলতে গেলে, গ্রামশুদ্ধ সবাই আমার এই গুলের গপ্পের খবর একেবারে হজম করে বসে আছে।

অবাক হওয়ার কথা! কিন্তু সত্যি বলতে কি, অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৌনে এগারোটায় আমি ট্রেন থেকে নেমেছি। তাহ'লে এগারোটার সময় খবরটা স্টেশনমাস্টারকে বাদ দিয়ে স্টেশনমাস্টারের



ঘরের আর পাঁচজন জেনেছে। সেই পাঁচজনের প্রত্যেকে যদি নতুন পাঁচজনকে জানায় আর এইভাবে জানাতে যদি পনেরো মিনিট সময় লাগে তাহ'লে সোয়া এগারোটার এই গুজবটি আর ৫ × ৫ = ২৫ জনের কানে গেছে, আর সবশুদ্ধ গুজবটি জানল ১ + ৫ + ২৫ = ৩১ জন। এই যে পঁচিশজন লোক গুজব শুনলে তারা প্রত্যেকে আরও পাঁচজন করে লোককে বলবে আর এই বলার জন্যে আবার পনেরো মিনিট সময় ধরা হচ্ছে। সেইজন্যে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এই খবরটি

আরও ২৫ × ৫ = ১২৫ জনে জানতে পারবে। আর খবরটি সাড়ে এগারোটায় সবশুদ্ধ জানল ৩১ + (২৫ × ৫) = ১৫৬ জন। এইভাবে পৌনে বারোটার মধ্যে খবরটি পাবে ১৫৬ + (১২৫ × ৫) = ৭৮১ জন। বারোটার মধ্যে পাবে ৭৮১ + (৬২৫ × ৫) = ৩৯০৬ জন। সোয়া বারোটার মধ্যে পাবে ৩৯০৬ + (৩১২৫ × ৫) = ১৯,৫৩১ জন, সাড়ে বারোটার মধ্যে পাবে ১৯,৫৩১ + (১৫৬২৫ × ৫) = ৯৭,৬৫৬ জন।

অর্থাৎ গ্রামে লোকসংখ্যা যদি এক লক্ষের কাছাকাছি হয়, তা'হলে পৌনে দু' ঘণ্টার মধ্যে প্রায় তাদের সকলেরই কানে গুজব যাবার কথা। আর পাঁচজন লোকের জায়গায় যদি সাতজন হিসেবে লোক ধরা যায় আর সময় কমিয়ে দশ মিনিটে নিয়ে এলে, এরকম দশটা গ্রামেও অল্প সময়েই খবর রটানো যায়।

ভেবে দেখার মত অবস্থাটা একবার।

সেইজন্যে গুজব রটাব না বা গুজবে কান দেব না।

সংখ্যার বৈচিত্র্য

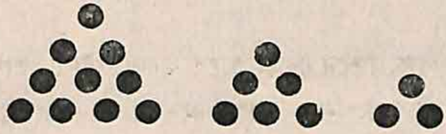
সংখ্যা অনেক রকমের হয়। গণিতের জগতে আজ পর্যন্ত কম ধরণের সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু সংখ্যাকে আকার দিয়ে চিত্রায়িত করার মধ্যে যে মুনসিয়ানা তেমন আর কোথাও দেখা যায় না।

গ্রীক দেশীয় পণ্ডিতেরা সংখ্যাকে জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট করায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

৩ —এই সংখ্যাটিকে কোন্ আকার দেওয়া সম্ভব? ৪ —সংখ্যাটির কি কোনো চিত্ররূপ হতে পারে?

গ্রীক সভ্যতায় এক ধরণের সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি ত্রিভুজ সংখ্যা।

যদি ৩, ৬, ১০, ১৫-কে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব, এদের সবাইকেই ত্রিভুজের আকারে সাজানো যায়। সেই রকম আছে



বর্গ সংখ্যা — যারা সাজালে বর্গের মতন। ৪, ৯, ১৬ — এদের সব

৪


৯


১৬


কটিই বর্গ সংখ্যার উদাহরণ।

ত্রিভুজ সংখ্যার ক্ষেত্রে ১৫-এর পরবর্তী সংখ্যাটি কি হবে ?

এই ত্রিভুজ সংখ্যা হাতে নিয়ে পরবর্তী ত্রিভুজ সংখ্যাটি সহজেই বের করা চলে। ১৫-এর ভূমিতে আছে ৫। আর ১ যোগ করি। সর্বমোট ৬। ১৫-এর সঙ্গে ৬ যোগ করে পরবর্তী ত্রিভুজ সংখ্যা ২১। বর্গসংখ্যার ক্ষেত্রে পরের বর্গ সংখ্যা বের করা কঠিন নয়। ৪, ৯, ১৬ যথাক্রমে ২, ৩, ৪-এর বর্গ? তাহলে পরের বর্গসংখ্যা ৫-এর বর্গ অর্থাৎ ২৫।

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পাঁচে বাণ, ছয়ে ঋতু, সাতে সিন্ধু, আটে বসু, নয়ে গ্রহ, দশে দিক—সংখ্যার এ পরিচয় বাংলার স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মত মাত্র যোগীন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের আমল থেকে শুরু হয় নি। আজ থেকে বহু বৎসর আগে অনেক শতাব্দীর চাকা পিছনে ঠেলে আমরা এমন এক যুগে, ভারতীয় গণিত চর্চার এমন এক অধ্যায়ে গিয়ে পৌঁছোব যখন থেকেই এর প্রচলন শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন থেকে গণিতের বিভিন্ন প্রসঙ্গে সংখ্যা-বাচক অঙ্ককে বুঝোনোর জন্য সংখ্যাবিযুক্ত শুধুমাত্র অর্থবোধক প্রতীক শব্দ নির্দিষ্ট হতে দেখা গিয়েছে এবং সেই সংখ্যা গুণান্বিত শব্দের ব্যবহার থেকেই গাণিতিক হিসাব-নিকাশে লোকে উদ্দিষ্ট সংখ্যাই বুঝতে শিখেছে।

একে চন্দ্রের কথা যখন বলি, তখন চাঁদের সংখ্যার কথাই আমরা চিন্তা করি। মহাকাশে পৃথিবীর উপগ্রহ, আমাদের অনন্ত সঙ্গী চাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের কারোর মনেই কোনো সংশয় নেই। নিঃসন্দেহে সে এক। প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিকেরা চাঁদের এই এককত্বের জন্য বিভিন্ন সংখ্যা বুঝোতে যখন শব্দের ব্যবহার করেছেন, তখন ১-এর আঙ্কিক শব্দ হিসেবে চাঁদকে বুঝিয়েছেন। গণিতের বিভিন্ন সংখ্যাযুক্ত দীর্ঘকায় অঙ্ককে সহজে মনে রাখবার জন্যে তাঁরা যখন শ্লোক বা ছড়ার আশ্রয় নেন, তখন ১ অঙ্কের পরিবর্তে চন্দ্রকে সেখানে স্থাপন করেন। শুধু চন্দ্র নয়, চন্দ্র অর্থবোধক অজস্র শব্দ তাঁরা ১ অঙ্কটির স্থলে বসান। শশী, বিধু, সোম, শশধর, শশাঙ্ক, নিশাকর হিমাংশু, মৃগাঙ্ক সব কটিরই অর্থ চন্দ্র। প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিকেরা ১ অঙ্কের স্থলে আপন আপন অভিরুচি অনুসারে চন্দ্র অর্থে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু চন্দ্র ছাড়াও অনেক শব্দ আছে, আরও অজস্র বস্তুর সন্ধান মিলবে, যেগুলির একাকীত্ব সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সংশয় নেই। আমাদের এই মর্ত্যলোক — ভূ-এর একাকীত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে। সেই কারণে গণিতের রাজ্যে 'ভূ' বললেও গাণিতিকেরা '১' বুঝতেন। 'ভূ' পর্যায়ে ক্ষিতি, ধরা, ভূমি, অবনী, বসুধা — এগুলির সব কটি '১' অর্থ ই নির্দেশ করে।

চন্দ্র ও ভূ অর্থ নির্দেশক শব্দ ছাড়াও আর যে সব শব্দ গণিতে '১' অঙ্কের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সেগুলি হল রূপ, যম, ব্রহ্ম। এর মধ্যে রূপের ব্যবহার বোধ হয় সর্বপ্রাচীন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থ। '১' বোঝাতে রূপের প্রয়োগ তার মধ্যেও রয়েছে।

একের পর দুই। দুইয়ের আঙ্কিক শব্দ পক্ষ। পাখীর দুটি ডানা অর্থাৎ দুটি পক্ষ। বোধহয় দ্বিত্ব সম্পর্কে প্রথম ধারণা পাখীর এই পক্ষ থেকে। তা ছাড়া চান্দ্রমাসে দুটি পক্ষ আছে—শুক্ল পক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষ। এ সব থেকেই সম্ভবত '২' বোঝাতে তাঁরা পক্ষ ব্যবহার করেছেন। হিন্দু গণিত সংক্রান্ত অনেক বইয়ে ২ অর্থে পক্ষের অজস্র ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। এদের উভয়ই অতি পুরাতন রচনা, তবে পঞ্চসিদ্ধান্তিকার রচনা সুনির্দিষ্টভাবে ৪০০ শকাব্দের প্রথমার্ধে।

দুইয়ের আঙ্কিক শব্দ হিসেবে আরও যে সব শব্দের প্রচলন ছিল, তার মধ্যে হস্ত অর্থবোধক কর ও বাহু উল্লেখযোগ্য। এদের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া ওষ্ঠ, জানু, যুগল, যুগ্ম, অয়ন (উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন)—সকলেই দ্বিত্ববাচক — এবং ২ অঙ্কের স্থলে অজস্র স্থানে ব্যবহৃত।

২ অঙ্কের পরিবর্তে আর একটি শব্দের বহুল প্রচলন গণিতে লক্ষ্য করতে পারি। সেটি হল নেত্র। আভিধানিক পরিভাষায় আরও কয়েকটি শব্দ — লোচন, নয়ন, অক্ষি, দৃষ্টি। দু'য়ে নেত্র শব্দের

ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও অন্য চিন্তায় এর মধ্যে অসঙ্গতি বোধ হতে পারে। একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষের পরে আমরা বলি তিনে নেত্র। নেত্র বা নয়ন দুটি হলেও আমরা তিনে নেত্র বলি কেন? আর কিছু নয়। শিবনেত্র থেকেই এর উৎপত্তি। শিবের ত্রি নয়ন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দৃষ্টি। নিঃসন্দেহে তার থেকে নেত্র অর্থে তিন। কিন্তু গাণিতিক ব্যবহারে নেত্র = ৩ কোথাও নজরে পড়বে না।

৩ সংখ্যার স্থলাভিষিক্ত ৩ গুণান্বিত বহুল প্রচলিত শব্দ অগ্নি। যজ্ঞবেদীর দক্ষিণস্থিত দক্ষিণ অগ্নি, পশ্চিমস্থিত গার্হপত্য, পূর্বস্থিত আহবনীয় অগ্নি। এর থেকেই ৩ সংখ্যাকে নির্দেশ করে অগ্নি। অগ্নির পরিভাষাও অনেক — জ্বলন, অনল, দহন, পাবক। গণিতে এদের প্রত্যেকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৩ সংখ্যাকে গ্রহণ করা হয়।

গুণও তিনের সমাহার। সৃষ্টির মধ্যে যত গুণই থাকুক না কেন তা সত্ত্ব, রজস ও তমসের অন্তর্গত হবেই।

এ ছাড়াও গণিতে ৩ সংখ্যার আঙ্কিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে রাম (পরশুধর রাম, ধনুর্ধর রাম, হলধর রাম), লোক (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল), কাল (ত্রি-কাল) প্রভৃতি শব্দ।

৪ — এই সংখ্যাটির বেলায় চতুর্বেদের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। গণিতে বেদ = ৪। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্বন। ৪ অর্থজ্ঞাপক আরও অনেক শব্দ আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারের সমন্বয় বলে যুগ গাণিতিক অর্থে ৪। জলধি, বারিধি, অব্ধি, নীরধি, সাগর — এদের প্রত্যেককে সংখ্যায় রূপান্তরিত করলে গণিতে ৪ পাওয়া যাবে। সাগর অর্থে ৪ বেদের কাল থেকেই প্রচলিত, কিন্তু সাগর অর্থে ৭ — এই সংখ্যাটিরও ব্যবহার দেখেছি। ৪ ও ৭—এই দুই অর্থেই সাগর ব্যবহৃত হবার কারণ কী? পূর্বাদি চার দিকে চার সাগর নির্দিষ্ট — এই চিন্তায় গণিতের সর্বত্র ৪ এর ব্যবহার লক্ষণীয়। ৭ অর্থে সাগরের ব্যবহার গণিতের কোথাও নেই। শুধু মাত্র কবির কল্পনাতেই তা কোথাও কোথাও স্থান লাভ করছে।

বাংলায় পাঁচে বাণ অর্থাৎ শর। শর পর্যায়ে পত্রী, কলম্ব, খগ, ইষু প্রভৃতি শব্দও ৫ সংখ্যা হিসেবে গণিতে ব্যবহৃত হয়েছে। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জন্যে গণিতে ইন্দ্রিয় অর্থও পাঁচ। পঞ্চভূতের সমাহার বলে ভূত এই শব্দেও পাঁচের ব্যবহার ঘটেছে। এ ছাড়া পাণ্ডব, বট প্রভৃতি শব্দ পাঁচ অর্থে সঙ্গত কারণেই প্রচলিত ছিল।

পাঁচে পঞ্চবানের মত ছয়ে ষড়্ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের মধ্যে আমাদের ঋতু বিভাগ — আর এই ঋতু বিভাগের জন্যে গণিতে ৬ এর স্থানে আঙ্কিক শব্দ হিসেবে ঋতু শব্দটির প্রচলন ঘটেছিল। ৬এর স্থানে গণিতে আর যে সব শব্দ ব্যবহৃত হত সেগুলি রস, অরি, কারক, ষন্মুখ। প্রাচীন আয়ুর্বেদের রস বিভাগে মধুরাদি ষড়্রসের কথা বলা আছে—তা থেকেই রস অর্থ ৬। অরি ও রিপু সমার্থক। মাৎসর্য, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়্রিপু থেকে ৬-এর ক্ষেত্রে অরির ব্যবহার ঘটেছে। কারক ও ষন্মুখের সঙ্গেও ৬-এর যোগাযোগ সুস্পষ্ট।

সাতে সপ্তসিন্ধুর কথা পূর্বে বলেছি — গণিত ছাড়া অন্যত্র এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গণিতে সর্বত্র সিন্ধু = ৪। সিন্ধু ছাড়া অন্য কয়েকটি শব্দ সুস্পষ্টরূপে গণিতে ৭ নির্দেশ করে। এরা শৈল, অশ্ব, মুনি, স্বর প্রভৃতি। শৈলের সমার্থক গিরি, মহীধর, অগ, নগ বলতেও ৭ বোঝাত। গণিতে অশ্ব = ৭ এর পিছনে একটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক চিন্তা রয়েছে। বেদে সপ্তাশ্ব অর্থ সূর্য ধরা হত। কিন্তু কেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সূর্যের বাহন হিসেবে সাতটি অশ্বের কল্পনা করা হয়েছে বলে সূর্য এই নামে ভূষিত হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ৭টি অশ্বকে কল্পনা করার পিছনে আর একটি চিন্তা পরিস্ফুট হচ্ছে। সূর্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে তা সাতটি ভিন্ন আলোক রশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হয়। সম্ভবত এই চিন্তাতেই সূর্যকে সপ্তাশ্ব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষি থেকেই গণিতে মুনি সমান সাতের কল্পনা রয়েছে। স্বরের বেলায়ও ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, রৈবত, নিষাদ — সপ্ত স্বরের ভিত্তিতে স্বর = ৭ এর প্রয়োগ রয়েছে।

বসু অর্থ ৮। গণিতে এর বহুল প্রচলন ঘটেছে। আপ, ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস—অষ্ট বসু দেবযোনি বিশেষ। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে এঁদের অধিষ্ঠান। গজ অর্থও ৮। পৌরাণিক কল্পনায় আট দিগ্‌গজ আট দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, নৈঋর্ত, অগ্নি) ধারণ করে আছে। তা থেকেই গজকে ৮-এর আঙ্কিক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গজের সমার্থক দন্তী, দিগ্‌গজ, হস্তী, মাতঙ্গ, কুঞ্জর প্রভৃতি শব্দও গণিতে আট অর্থ বহন করত।

গণিতে ৯ বোঝাতে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হত তাদের মধ্যে নন্দ, অঙ্ক, গ্রহণ প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য। মগধের নন্দ নামাঙ্কিত নয় রাজা থেকে নন্দ অর্থে গণিতে নয় বোঝাত। অঙ্ক = ৯ এর ক্ষেত্রে গণিতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত নটি সংখ্যার কথাই মনে রাখা হয়েছে। এখানে শূন্যকে অঙ্কের মধ্যে ধরা হয়নি। গ্রহ = ৯ মহাকাশে গ্রহের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত।

দশে দিকের কথা কারো অজানা নয়। আটে গজ প্রসঙ্গে যে আট দিকের কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে উর্ধ্ব, অধঃ যোগে এই দশ দিক। ১০ বুঝোতে দিক ছাড়াও পঙক্তির ব্যবহারও ঘটেছে। পঙক্তি একটি ছন্দের নাম। প্রতি পাদে দশ অক্ষর থাকে বলেই গণিতে এই জাতীয় ব্যবহার। তা ছাড়া অঙ্গুলি, অবতারও গণিতে দশ হিসেবে নির্দিষ্ট রয়েছে।

১ থেকে ১০ ছাড়াও সংখ্যার রাজ্যের আরো অনেক সংখ্যাকে বিভিন্ন গাণিতিক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এদের সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু শূন্যের কথা বাদ দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শূন্যের আদিরূপ ছিল বিন্দু। অবশ্য এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। বিন্দু অতি ক্ষুদ্র, অবয়বহীন, অর্থাৎ সে শূন্য মনে হয়। আবার শূন্যের সঙ্গে অভাবের যোগ আছে। তার থেকে আঙ্কিক শব্দ হিসেবে এল আকাশ। এবং আকাশের পর্যায়ে খ, নভ, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, অম্বর, অনন্ত, গগন প্রভৃতি শব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিক বইয়ে, জ্যোতিষ গ্রন্থে, দানপত্রে, শিলালিপিতে, প্রাচীন কাব্যে সংখ্যাকে শব্দে প্রয়োগ করবার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে সংখ্যাকে শব্দে ব্যবহারের কিছু না কিছু নজীর রয়েছে। স্তব, স্তুতি, গাণিতিক সূত্রের মধ্যে সংখ্যার যেখানে ব্যবহার ঘটেছে, প্রধানত সেখানেই সংখ্যা শব্দে রূপান্তর লাভ করেছে।

সংখ্যাকে শব্দে রূপান্তরের বহুল প্রচলন, এদেশে খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে। ভারতবর্ষ ছাড়া সংখ্যাকে শব্দে রূপান্তর করবার অভিনব ও কার্যকরী এই পদ্ধতি অন্য কোনো দেশে তত পূর্বে প্রচলিত ছিল না। এ দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে এ পদ্ধতি প্রবর্তনের পথিকৃৎ বলা চলতে পারে।

এখন বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাক।

বৃহৎ-সংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল পুলিশ-সিদ্ধান্ত থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলেছেন :

খ খ অষ্ট মুনি রাম অশ্বি নেত্র অষ্ট স্বর রাত্রিপাঃ।

সংখ্যায় রূপান্তর করবার আগে প্রতিটি শব্দের পাশে তার উদ্দিষ্ট অঙ্ক বসালে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ?

খ (০) খ (০) অষ্ট (৮) মুনি (৭) রাম (৩) অশ্বি (২) নেত্র (২) অষ্ট (৮) স্বর (৫) রাত্রিপা (১)।

অঙ্কের বামদিকে গতি হিসেবে সংখ্যাটি ১৫৮২২৩৭৮০০।

অন্য প্রসঙ্গে একটি ধর্মমঙ্গলের কাল সম্পর্কে উদ্ধৃতি আছে ঃ

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার॥

এর থেকে পাওয়া যায় পুঁথিটি ১৫৮৪ শকাব্দের।

সংখ্যাকে এই জাতীয় শব্দে রূপান্তর যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভারতীয়েরা সেদিক দিয়ে নিশ্চয় সকলের অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

লক্ষ নিযুত কোটি

গণিতের বড় বড় সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোনো ধারণা নেই। হাজার নিয়ে কথাবার্তা হয় আমাদের, তাকে ছাড়িয়ে বড় জোর লক্ষের ঘরে, খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কোটি পর্যন্ত এগোতে পারি— ব্যাস, সেখানেই শেষ। তার চেয়ে বড় কোনো সংখ্যার সঙ্গে কাজে কর্মে যোগাযোগও নেই, প্রয়োজনও পড়ে না।

ধরা যাক, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে কোনো বক্তৃতায় অনেক লোক জমা হল। ময়দান থেকে ফিরছি। কী রকম লোক হয়েছিল কেউ জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই সেই ভীড় সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করব। হয়তো বলব, অনেক লোক। আতিশয্যে বলতে পারি সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছিল। সংখ্যায় বলতে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের কথা স্বভাবতই মুখে আসবে — কিন্তু ওই পর্যন্তই — ঐ লক্ষের ঘর পর্যন্ত। পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ, বড় জোর বিশ, পঁচিশ। জনসমাবেশের বেলায় সাধারণত আর বেশী এগোবার দরকার পড়ে না।

দেশের জনসংখ্যার বেলায় আমরা আর একটু বেশী এগোই, কোটি পর্যন্ত। কোটি সম্পর্কেও আমাদের কিছু ধারণা আছে। পত্রিকায় কোটি কোটি কালো টাকার খবর পাচ্ছি। এক একটা

পঞ্চবার্ষিকীতে হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনাও দেখছি। কিন্তু ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ, ওর চেয়ে বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ কারবার নেই আমাদের, দরকারও কিছু পড়েনি কোনোদিন।

কিন্তু এই কোটির উর্ধ্বেও অনেক বড় বড় সংখ্যা আছে। এক লক্ষ কোটির কথা কখনও কেউ চিন্তা করেছে? ধরা যাক, এক লক্ষ কোটি টাকা। যেমন, দশ কোটি, একশো কোটি, ছশো কোটি, হাজার কোটি, তেমনি এক লক্ষ কোটি। দশ লক্ষকে যেমন মিলিয়ান বলে, তেমনি লক্ষ কোটিকে বিলিয়ান। সংখ্যায় তা দাঁড়ায় ১০০০০০০০০০০০০।

ধরা যাক, কেউ সেই এক লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসায় নামল। চিন্তাটাকে আর একটু উর্বর করি। মনে ভাবি, তার পূর্বের কোনো পুরুষে কেউ কখনো ব্যবসা করেনি, ভবিষ্যতেও কোনো পুরুষ করবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ভুল পথে এসেছিল সে। লোকসান হতে লাগল — রোজ, প্রতিদিন এক হাজার টাকা লোকসান। হাতে এক বিলিয়ান টাকা। পুরো টাকাই লোকসান হতে কত দিন লাগবে? কত মনে হয়? পাঁচ বছর, দশ বছর? কিছু কম, নাকি সামান্য বেশী? আমার কথা বিশ্বাস হবে না। নিজেই হিসেব কষলে বোঝা যাবে, ২০০০ বছরের বেশী সময় লাগবে। মানুষের পরমায়ুকে গড়ে ষাট সত্তর বছর ধরেও দেখতে পাব যে, সম্পূর্ণ বিলিয়ান টাকা চল্লিশ পুরুষ আগে ফুরোবার কোনো আশঙ্কাই নেই।

কিন্তু এক বিলিয়ান টাকা নিয়ে ব্যবসায় নামবার আগে নিশ্চয় টাকাটা গুনে নেব। পাঁচ দশ টাকার বেলায় আমরা কি কিছু কম সতর্ক? এ পাশ ও পাশ দেখে ভাল করে গুনে নিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। বিলিয়ানের বেলায় তো কথাই নেই। অত টাকার ব্যাপার! না গুনে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। দিন রাত না ঘুমিয়ে গুনে চলেছি। প্রতি সেকেণ্ডে এক খানা করেই গুনি। তবু একার সাধ্য কী সেই টাকা গুনে শেষ করি। শুধু একা সম্ভব না হলে ওইভাবে গুনবার

জন্য আর একজন বন্ধুকে নিয়ে আসি, দু'জনে মিলেও সব টাকা গুনে শেষ করতে পারব না।

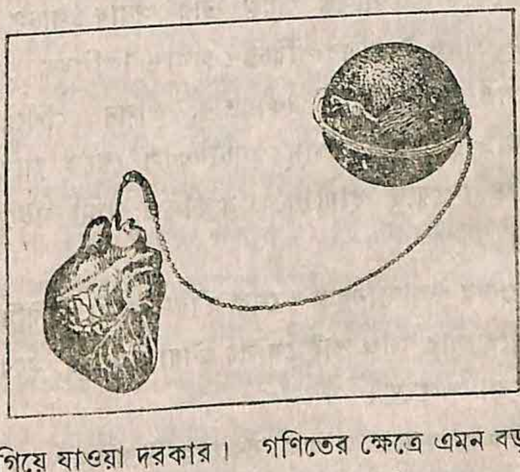
কিন্তু বিলিয়ান টাকা কল্পনার ব্যাপার মাত্র। সেই কল্পনা বা গণিতের দুরূহ ও বড় অঙ্কের কথা বাদ দিলেও বাস্তবে আমাদের ভিতরে বাইরে, আমাদের চতুর্দিকে অনেক বড় বড় সংখ্যা ছড়িয়ে আছে। উপরের নীল আকাশে কত তারা আছে? নীচে সমুদ্রে বালির সংখ্যা কত? সাধারণ হিসেবে এরা সব অসংখ্য বড়। এত বড় যে আমরা তা কল্পনাতেও আনতে পারি না। কিন্তু বড় সংখ্যা খুঁজবার জন্যে আমাদের সমস্ত আকাশ পরিভ্রমণের দরকার নেই, না আছে দরকার সমুদ্রের বালি তোলপাড় করবার। সঙ্কীর্ণ স্থান, সামান্য আয়তনের মধ্যেও আমরা এই বড় সংখ্যার খোঁজ পেতে পারি।

যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিই, সেই বাতাসের মধ্যেও এরকম বড় সংখ্যা লুকিয়ে আছে। এক ঘন সেন্টিমিটার কতটুকু বা জায়গা। কড়ে আঙ্গুলের প্রথম পর্বটুকুই নয়। ভাবলে বিস্মিত হবার কথা, সেই জায়গাটুকুর মধ্যে ২৭,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বাতাসের অণু আছে। এই সংখ্যাটি যে কত বড় তা আমরা ধারণাতেই আনতে পারি না। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। এই বৃদ্ধির গতিবেগে যদি কোনোদিন লোকসংখ্যা ২৭,০০০,০০০,০০০,-০০০,০০০,০০০-তে পৌঁছোয় তাহলে অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ এবং স্থলভাগ মিলেও সকলের দাঁড়ানোরই জায়গা হবে না। জলভাগ এবং স্থলভাগ জুড়ে দিয়ে পৃথিবীতে জায়গা আছে মোটা-মুটি ৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বর্গ মিটার। উপরের জনসংখ্যাকে পৃথিবীর এই জায়গার পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে দেখা যায় যে, এক বর্গ মিটারে পঞ্চাশ হাজারের বেশী লোক দাঁড়াতে হবে। রথের মেলায় খুব জাঁকাজাঁকি করে এক বর্গমিটারে আমরা ক'জন দাঁড়াতে পারি? শীর্ণকায় দশজনই হয় না, স্থূলকায় হলে তো আর কথাই নেই।

কিন্তু বাতাসের কথা বাদ দিয়েও আমরা আমাদের নিজেদের

দেহের মধ্যেও এরকম বড় সংখ্যার সন্ধান পেতে পারি। মানব দেহের মধ্যে ছ'রকম কণিকার সংমিশ্রণ আছে। লোহিত কণিকা আর শ্বেত কণিকা। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মাইক্রোস্কোপে মাত্র এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে অসংখ্য লোহিত কণিকা দেখতে পাওয়া যায়। এক ফোঁটায় পঞ্চাশ লক্ষের মত। হিসেব নিকেশ করে দেখা যায়, একজন সাধারণ মানুষের দেহে ১৫,০০০,০০০,০০০,০০০ লোহিত কণিকা আছে। ভাবুন দেখি, ১৫,০০০,০০০,০০০,০০০ লোহিত কণিকা! সেই লোহিত কণিকাকে পর পর সাজিয়ে দৈর্ঘ্য যতটা হয় সেই দৈর্ঘ্যের দড়ি দিয়ে পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে তিন পাকে বাঁধা সম্ভব।

বড় সংখ্যার আরও দৃষ্টান্ত আছে। এডিংটন দেখিয়েছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইলেকট্রনের সংখ্যা ১৫,৭৪৭,৭২৪,১৩৬, ২৭৫, ০০২, ৫৭৭, ৬০৫, ৬৫৩, ৯৬১, ১৮১, ৫৫৫, ৪৬৮, ০৪৪, ৭১৭, ৯১৪, ৫২৭, ১১৬, ৭০৯, ৩৬৬, ২৩১, ৪২৫, ০৭৬, ১৮৫, ৬৩১, ০৩১, ২৯৬। আশি অঙ্কের এই সংখ্যা লক্ষ, নিযুত, কোটির আওতার অনেক বাইরে। হতবাক হয়ে থেমে পড়বেন না। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের



কিছুটা এগিয়ে যাওয়া দরকার। গণিতের ক্ষেত্রে এমন বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ কর্ম চলছে যেগুলি দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল লম্বা। এমন বড় সংখ্যাও আছে যে, সেই সব সংখ্যার সামান্য এক একটা অংশকেও

ছাপার অক্ষরে সাজালে অভিধান আকারের মোটা বই রচনা হয় আর সম্পূর্ণ সংখ্যার জন্যে ঐরকম অভিধান আকারের বই ছাপিয়ে পৃথিবীর যে কোনো বড় লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাওয়া যায়।

আর আমাদের চিন্তা ও ধারণার মধ্যে যেসব সংখ্যা, তারা এই সব সংখ্যার কাছে সমুদ্রে জলবিন্দুর মত।

বিস্ময়ের কথা বৈকি !

গাণিতিক রূপকথা

যে সব ধাঁধায় গল্পের আমেজ আছে সে সব ধাঁধাকে স্বচ্ছন্দে রূপ-কথার সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। রূপকথা যেমন তার নিজের টানেই এদেশ থেকে ওদেশে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত, তার উৎপত্তির কোনো পরিচয় নেই, নাম-ঠিকানা নেই, সাল-তারিখ নেই, দেশ-বিদেশ নেই, অথচ সব দেশের, সব কালের ছেঁড়া কাঁথা থেকে খাট-পালঙ্ক পর্যন্ত তার অবাধ চলাচল ; ধাঁধাও সে রকম। তারও উৎপত্তির পরিচয় কোথাও লিপিবদ্ধ নেই নিপুণ-ভাবে। সেও তার আপন স্বকীয়তায়, আপন বৈশিষ্ট্যে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে কোন্ প্রাচীনকাল থেকে আর সার্বজনীন হবার স্বীকৃতি পেয়েছে স্থায়ীভাবে সংকলিত নানা বইয়ের পাতার ভিতর দিয়ে।

সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানযুক্ত অনেক ধাঁধার মধ্যে গাণিতিক চিন্তার ছোঁয়া লেগেছে আর আজ তাই সে সব ধাঁধা সকলের মুখে গাণিতিক রূপকথা আখ্যা পেয়েছে।

গাণিতিক রূপকথার আসরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাহিনী বুড়ি মা আর তিন মেয়ের গল্প।

তিন মেয়ে ছাড়া বুড়ির যত্নের অনেকগুলি হাঁস ছিল। তারা

প্যাঁক প্যাঁক করে যখন-তখন, খড়কুটো খায় এখানে-ওখানে আর রোজ সকালে হিসেব করে বুড়িকে ডিম দেয় নিয়ম মত। সেই ডিম জমিয়ে বুড়ি সপ্তাহে সপ্তাহে হাটের পথে চলে। বাড়ি থেকে হাট অনেক দূর। লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করতে করতে বুড়ি বাড়ি থেকে বেরোয় সেই কোন্ সকালবেলায়। তারপরে যেই সূর্য আকাশের মধ্যিখানে আসে, চড়া রোদ ওঠে, দুপুর হয়, তখন বুড়ি ঘাম মুছতে মুছতে হাটে এসে পৌঁছোয়। আর হাটে বুড়িকে চেনে সকলে। সবাই তার কাছে আসে, ডিম কেনে, বুড়ি আঁচলে পয়সা বাঁধে। তারপরে সব ডিম বেচে সন্ধে হওয়ার আগেই আবার লাঠির পথ ধরেই ঠুক্‌ঠুক্ করে বাড়ি ফিরে আসে। এইভাবে দিন চলে, কষ্টেসৃষ্টে চলে, বুড়ির চলে, বুড়ির তিন মেয়ের চলে।

কিন্তু যত দিন যায় বুড়ির বয়স আরও বাড়ে, চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। এক সময়ে এক হাটবারে বুড়ি মেয়েদের ডেকে বললে, দেখো বাছারা, আমার বয়স হল, এতটা পথ আর চলতে পারি নে, আজ তোমরা হাটে যাও।

তিন মেয়ে বলল, বেশ যাচ্ছি।

বুড়ি খুশী হল। তারপরে বলল, এই দেখ, নব্বুইটা ডিম রয়েছে ঘরে। তোমরা সবাই ভাগাভাগি করে কয়েকটা করে নাও। কিন্তু সমানভাবে ভাগ করবার দরকার নেই। বড় মেয়ে নিক দশটা। মেজো বড়োর পিছনে পিছনে, সে নিক তিরিশটা। আর বাকি যা তা ছোটোর। তার ভাগে পঞ্চাশটা। এখন প্রত্যেকের ভাগে ডিমের সংখ্যা আলাদা বলে যে ডিম বেচে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পয়সা নিয়ে আসবে তা চলবে না। বড় সবদিকে সব চাইতে বড়, কাজেকর্মে বিদ্যেবুদ্ধিতে। তাকে দশটা ডিমের জন্যে আনতে হবে তিরিশ টাকা। মেজো মেয়ের কাছে তিরিশটা ডিম, কিন্তু বুদ্ধিতে সে বড়োর কাছে দাঁড়াতে পারে না, কাজেই ডিমের সংখ্যা বেশী হলেও তাকে আনতে হবে সেই তিরিশ টাকা। আর ছোটটি ছেলেমানুষ,

তার ডিমের সংখ্যা আরও বেশী। তবু বুড়ি মা তাকে তিরিশ টাকাই আনতে বলল বড়ো দুই মেয়ের মত।

এখানে যে যার হিসেব মত দরে ডিম বেচে এলে সহজেই বুড়ির কথা মান্য করে কাজ সারা চলতে পারত। তিন মেয়ে সে রকম কথাই চিন্তা করছিল। কিন্তু বুড়িমা সে সুযোগও দিল না। পাকা গণিতের লোক সে। সে বলল, বাজারে গিয়ে একই খদ্দেরের কাছে তিন বোনে তিন রকম দর হাঁকবে তা চলবে না। তাতে সুনাম নষ্ট হয়, লোকে নিন্দে করে। দুপুরে গিয়ে হাটে বসবে তোমরা। খদ্দেরে ডিম কিনতে আসবে একের পর এক। এক দর চাইতে হবে তিন-জনকে। অবশ্য বিকেল হয়ে এলে দাম চড়ে ডিমের হাটে। যত বিকেল হয়, ডিমের ঝুড়ি ফাঁকা হয়ে আসে, চাহিদা এত যে খদ্দেরদের জোগানো যায় না ইচ্ছে মত। কাজেই দাম চড়ে সে সময়ে দেখতে দেখতে। তখন তোমরাও দাম চড়াতে পারো দরকার হলে—কিন্তু একটি বোনে দাম চড়াবে আর একটি বোনে দাম চড়াবে না তাতো আর হয় না। দর বেশী চড়াতে গেলে তিন বোনকে মিলে-মিশে একসঙ্গে চড়াতে হবে।

মেয়েরা ঘাড় নাড়ল, তথাস্তু।

এখন পাঠক, সমাধান বের করবার জন্যে এবারে সচেষ্ট হতে হবে। ধাঁধার আসল গুরুত্ব, কী দরে ডিম বিক্রী করা হবে তার উপরে। ডিমের সংখ্যা ভিন্ন, অথচ এমন কৌশলে দর ঠিক করতে হবে যাতে প্রত্যেকের রোজগার তিরিশ টাকা হয়। চিন্তার কথা নিঃসন্দেহে, কিন্তু বড় মেয়ে পথ চলতে চলতে বুদ্ধির দীপ্তিতে আর চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে সমাধানের আলো দেখতে পেল।

অন্য দুই বোনকে সে বলল, দেখো, বাজারে লোকে ডজন হিসেবে ডিম বেচে। কখনো কখনো জোড়া হিসেবেও বেচে। ইচ্ছে হলে পাঁচটার হিসেবেও বেচতে পারে আবার বা দশটার হিসেবেও। আমরা

পাঁচ দশের হিসেবে না গিয়ে সাতটার হিসেবে বেচব। সাতটা ডিম তিন টাকায়।

ছোট বোন বলল, দিদি, বড্ড সস্তা।

মেজ বোন বলল, এত কষ্ট করে এতটা পথ রোদে পুড়ে বাজারে যাচ্ছি। যাই বল দিদি, অত সস্তায় বেচতে মন সয় না।

বড় বোন বুঝিয়ে বলল, মার কথা রাখতে গেলে সাতের হিসেব ধরে বেচব প্রথমে। সে হিসেবে সাতের বেশী ডিমও বেচতে পারি আমরা। চৌদ্দটা বেচতে পারি ছ' টাকায়, একুশটা ন' টাকায়, আঠাশটাও দিতে পারি কেউ চাইলে বারো টাকায়। কিন্তু আট, দশ, বারো বা আঠারো, উনিশ, কুড়িটা ডিম চাইলে সাতের হিসেব খাটে না। পয়সাকড়ির হিসেবনিকেশ নিয়ে গোলমাল হওয়ার নানা আশঙ্কা। কাজেই সে রকম ডিম বেচতে পারি নে আমরা। আর সাতের কমেও ডিম বেচতে পারব না আমরা একই কারণে।

বড় বোন আরও বলল, সাতটা হিসেবে ডিম বেচবার পরে আমার দশটা ডিমের বাকি রইবে তিন। মেজ আঠাশটা বেচবে সাতটা হিসেবে, বাকি রইবে দুই। আর ছোট বেচবে উনপঞ্চাশটি, তার রইবে শুধু একটি। এদিকে সাতের হিসেবে বেচতে বেচতে সূর্য পশ্চিমে নামবে, বেলা পড়ে আসবে, বিকেল হবে, ডিমও কমে আসবে প্রত্যেকের ঝুড়িতে। সেই সময়ে কায়দা করে চড়া দর হাঁকব এক, দুই আর তিনটে ডিমের বেলায়।

ছোট বোন বলল, কত করে নেব আমরা?

বড় বোন বলল, এক একটা ডিমের জন্যে ন' টাকা।

মেজ বোন বলল, বড় বেশী দর দিদি, পারলে কিছু কমিয়ে আনো।

বড় বোন রাজী হল না, সেটি হবার উপায় নেই মায়ের কথা রাখতে গেলে।

দুপুর হয় হয়, হাটে এসে পৌঁছোল তিন বোনে।

প্রথমে সস্তার দর। বেলা গড়াবার আগে বড় মেয়ে দশটা ডিমের সাতটা ডিম বেচে দিল মাত্র তিন টাকায়।

মেজোর তিরিশটা ডিম। সাতটার দরে তারও আঠাশটা বিক্রী হয়ে গেল বারো টাকায় দেখতে দেখতে। তার কাছে আর বাকি দুটি ডিম।

আর ছোটোর পঞ্চাশটি ডিম সাতটার দরে বেচে বেচে সে উনপঞ্চাশটি বিক্রী করে পেল একুশ টাকা। শুধু বাকি এক।

বিকেল গড়িয়ে আসে। বাকি ডিম কটার জন্যে দাম চড়িয়ে দিয়ে তিন বোনে বসে রইল তিন কোণে।

এমন সময়ে ধরা যাক শহরের এক সওদাগরের বাড়িতে অতিথি এল।

সওদাগরের বৌ বাড়ির রাঁধুনীকে বাজারে পাঠাল। ছয় অতিথি বাড়িতে। বিশিষ্ট অতিথি সব। খাওয়া-দাওয়ায় আদর যত্ন করা দরকার। আর গৃহিণী অতিথিদের রুচির কথা জানতেন। অতিথিরা ডিম পছন্দ করেন বেশী মাছ-মাংসের বদলে। কাজেই ডিমের তরকারি রাঁধবার কথা মনে পড়ল সওদাগর বৌ-এর। ছটা ডিমের প্রয়োজন সে জন্যে। রাঁধুনী বাজারে এসে ঘুরে ফিরে দেখল একবার। ডিমের বাজার ভাল নয়। চারিদিক ফাঁকা হয়ে এসেছে। শুধু তিন কোণে তিনটি মেয়ে। একজনের কাছে একটি ডিম, আর একজনের কাছে দুটি আর তৃতীয় জনে তিনটি ডিম নিয়ে বসে আছে।

বড় মেয়ের ডিম বেশী, রাঁধুনী বড় মেয়ের কাছেই ধর্ণা দিল আগে।

ডিম কত করে?

ন' টাকায় একটি।

ন' টাকায় একটি! অসম্ভব। রাঁধুনী অবাক হল।

হ্যাঁ, বড় মেয়ে আবার বলল, ন' টাকায় একটি।

রাঁধুনী বলল, বড় বেশী দর, সবকটা ডিম নেব, কিছু কম কর।

না, বড় মেয়ে শক্ত হল, দর এক, তাতে নিতে হয় নাও, না হলে চলে যাও।

কথায় বড় ঝাঁঝ। র াঁধুনী প্রমাদ গুনল।

মেজো মেয়ের কাছে ছুটল র াঁধুনী, কিন্তু সেখানেও সেই একই উত্তর, ন' টাকায় একটি।

নিরাশ হয়ে র াঁধুনী এল ছোট মেয়ের কাছে। কিন্তু জবাব শুনে খুশি হতে পারল না। ন' টাকা দিলে ডিমটি নাও, না হলে ঘুরে যাও। অদল বদল নেই নানা অনুরোধ উপরোধেও।

র াঁধুনী যখন দেখল যে, আর কোনো উপায় নেই তখন সে ন' টাকা করেই সবকটি ডিম নিয়ে বাড়ি ফিরল।

বড় মেয়ে তিনটি ডিমের জন্যে র াঁধুনীর কাছে পেল সাতাশ টাকা। কাজেই তার দিনের শেষে হল তিরিশ টাকা। মেজ র াঁধুনীর কাছে পেল আঠারো টাকা আর আগে ডিম বেচে পেয়েছে বারো টাকা, সব মিলে তিরিশ টাকা। আর ছোট বাকি একটা ডিমের জন্যে পেল ন' টাকা। তাছাড়া আগে উনপঞ্চাশটা ডিম বেচে একুশ টাকা। সবশুদ্ধ তিরিশ টাকা।

বুড়ি মা তার মেয়েদের বুদ্ধির দৌড় দেখে খুশী হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

গাণিতিক রূপকথা বলা চলতে পারে এ জাতীয় আরেকটি ধাঁধার উল্লেখ করব।

এবার দুই রাজার কাহিনী। পাশাপাশি দুটি রাজ্য, জটিলপুর আর কুটিলপুর। এ রাজ্যের সঙ্গে ও রাজ্যের বড় ভাব। রাজায়-রাজায়, প্রজায়-প্রজায়। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে দুই রাজ্যের মধ্যে। এ রাজ্যের আনন্দ-উৎসবে ও রাজ্যের লোকেরা আসে। ও রাজ্যের আচার-অনুষ্ঠানে এ রাজ্যের লোকেরা যায়। দীর্ঘ দিনের গাঢ় প্রীতির বন্ধন। তবু কেন কে জানে, সেই বাঁধনেও ফাটল ধরল একদিন।

আর সেই ফাটলও যখন বড় হয়ে নজরে এল তখন এক রাজ্যের রাজা অপর রাজ্যের রাজাকে জব্দ করবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজে বেড়াতে লাগল ; আর মন্ত্রী সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে কুটিলপুরের রাজা জটিলপুরের রাজাকে জব্দ করবার একটা উপায়ও উদ্ভাবন করে ফেলল। অভিনব উপায় সন্দেহ নেই।

সেই উপায় এতদিনের সব সমতাকে ঘুচিয়ে দিল। এতদিন দুই দেশের পয়সাকড়ির কোনো পার্থক্য ছিল না। জটিলপুরের এক টাকা কুটিলপুরের এক টাকা হিসেবেই ব্যবহৃত হোত। আবার কুটিলপুরের এক টাকার দাম জটিলপুরেও এক টাকা ছিল। কিন্তু এখন থেকে আর তা নয়। জটিলপুরের এক টাকা কম করে ধরা হবে কুটিলপুরে। রাজার আদেশে তা দাঁড়াবে নব্বুই পয়সার সমান।

জটিলপুরের রাজাই বা ছাড়বে কেন? সেখানেও ঘোষণা করা হল, কুটিলপুরের এক টাকা কম করে ধরা হবে জটিলপুরে। কুটিলপুরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যোগ্য প্রত্যুত্তর। কুটিলপুরের এক টাকা জটিলপুরে ধরা হবে নব্বুই পয়সা।

এখন দুই রাজ্যের সীমানার কাছে বুদ্ধিমান এক লোক বাস করে। সে এর সুযোগ নিল কৌশল করে।

কুটিলপুরের এক টাকা নিয়ে সে কুটিলপুরেরই এক দোকানে গেল। আর একটা সিগারেট কিনলে দশটা পয়সা দিয়ে। হিসেব মত তার কুটিলপুরের নব্বুই পয়সা ফেরৎ পাওয়ার কথা। দোকানদারও তাই দিল। কিন্তু কুটিলপুরের নব্বুই পয়সা তো জটিলপুরের এক টাকার সমান। কাজেই বুদ্ধিমান লোকটি জটিলপুরের এক টাকার নোট চাইল কুটিলপুরের এক টাকার বদলে। সঙ্গত প্রস্তাব। দোকানদার সেই মত কাজ করলে।

বুদ্ধিমান লোকটি এবারে জটিলপুরে গেল জটিলপুরের সেই এক টাকার নোটটি সঙ্গে নিয়ে। আবার একটি সিগারেট কিনল দশ

পয়সায়। জটিলপুরের নব্বুই পয়সা ফেরৎ পাবে সে। কিন্তু জটিল-পুরের নব্বুই পয়সা কুটিলপুরের এক টাকার সঙ্গে সমান। সেইজন্য কুটিলপুরের এক টাকার নোট নিল জটিলপুরের নব্বুই পয়সার সঙ্গে বদলি করে। আর দুই দোকান ঘুরবার পরে ঘরে ফিরে এল দুটি সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে। অথচ প্রথমে সে কুটিলপুরের এক টাকার নোট নিয়েই দোকানে গিয়েছিল। এখন সেই কুটিলপুরের এক টাকার নোটও আছে, আর সঙ্গে রয়েছে আরও দুটি সিগারেট টানার আনন্দ। কাজেই একটি পয়সাও খরচ হল না তার।

লোকটির লাভ করবার কৌশলে কৌতুক বোধ করতে পারি আমরা, কিন্তু ধাঁধার প্রশ্ন শেষ হয়নি এখনও, ক্ষতি কার হল সেই নিয়েই ধাঁধা।

গাণিতিক রূপকথার জগতে এমন আরও অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। তারা যেমন আমাদের চিন্তার খোরাক জোগায়, তেমনি আমাদের মনকে খুশি করে।

গাণিতিক নিয়মে পৃথিবীর আয়ু কত?

পৃথিবীর আয়ু কত?

প্রচলিত এক কাহিনীতে আছে, ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করবার সময়ে কাশীর মন্দিরের ভেতরে তিনটি হীরকদণ্ড স্থাপন করেন। এর একটিতে আছে ৬৪টি সোনার চাকতি। প্রত্যেকটি চাকতিরই ব্যাস আলাদা। দণ্ডে এরা আছে যেমন তেমন ভাবে নয়। বাজারে ওজনের বাটখারা, ৫ কেজি, ২ কেজি, ১ কেজি থেকে ৫০ গ্রাম, ২০ গ্রাম বা ১০ গ্রাম পর্যন্ত যে রকম ক্রমান্বয়ে উপরে উপরে রাখা হয়,

দণ্ডে এদের অবস্থান সেইভাবে। অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ব্যাসের চাকতিটি নীচে ; যার ব্যাস সবচেয়ে কম, সে সকলের উপরে।

এখন এই দণ্ডের সোনার সব কটি চাকতিকে তৃতীয় দণ্ডটিতে নিয়ে যেতে হবে ; মাঝের দ্বিতীয় দণ্ডটির সাহায্য নিয়ে।

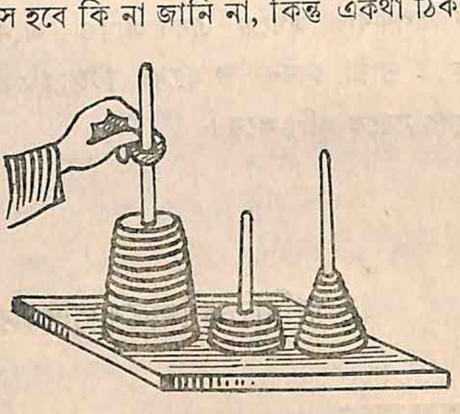
কী ভাবে ?

বিধি পূর্ববৎ। অর্থাৎ তৃতীয় দণ্ডটিতেও কখনোই কোনো ছোট চাকতির উপরে বড় থাকবে না এবং দ্বিতীয় দণ্ডটিকে কাজে লাগানোর সময়েও তা বলবৎ থাকবে। আর এক কথা, একসঙ্গে একের বেশি চাকতি সরানো চলবে না কিছুতেই।

কাহিনীতে আছে, এইভাবে একটি দণ্ড থেকে অন্য দণ্ডে সব কটি চাকতি সরানো হলেই পৃথিবীর আয়ু শেষ — পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

কি মনে হয়, কথাটা অবিশ্বাস্য ?

পৃথিবী ধ্বংস হবে কি না জানি না, কিন্তু একথা ঠিক যে, এইভাবে



একটি দণ্ড থেকে আর একটি দণ্ডে বিধি অনুসারে ৬৪টি সোনার চাকতিকে নিয়ে যেতে সবশুদ্ধ প্রয়োজন ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, ৫৫১, ৬১৫ সংখ্যক চালের।

প্রতিটি চালে যদি সময় লাগে কম করে ১ সেকেণ্ড, তাহলে ৩৬০০ চালে ১ ঘণ্টা। দিনে রাতে অবিশ্রাম যদি চাল দেওয়া হয়, তাহলে ১ দিনে পুরো ২৪ ঘণ্টায় ৮৬৪০০ চাল। বাড়িয়ে ১ লক্ষই ধরা যাক।

বছরে চালের সংখ্যা তখন ৩৬৫০০০০০ অর্থাৎ ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ। এবং ৫০০০০ কোটি বছরের আগে তত চাল দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

পৃথিবীর অবস্থাটা তখন কি রকম থাকবে সে কথা কে কল্পনা করবে?

দাবার ছক নিয়েও এ রকম একটি উপাখ্যান আছে।

বাদশাহ শেরাম দাবা খেলার চালের বৈশিষ্ট্য দেখে তার আবিষ্কর্তা সেসা কে বললেন, তোমাকে আমি পুরস্কৃত করব। কী চাই তোমার?

মেধাবী সেসা সম্রাটকে বলল, জাঁহাপনা, কী আর চাইব, আপনার কাছে, আপনি ধাঁধার ছক ধরেই আমাকে পুরস্কার দিন।

কী পুরস্কার?

দাবার ছকের প্রথম ঘরের জন্যে একদানা গম, দ্বিতীয়টার জন্যে দুটো, তৃতীয় ঘরের জন্যে চারটে — এইভাবে চৌষট্টি ঘরের জন্যে যা পাওনা হয়, তাই দেবেন।

তাজ্জব কী বাত। বাদশাহের কাছে কি চাইতে হয়, তাও শেখেনি সেসা। স্রেফ কটা গমের দানায় মন খুশি।

কিন্তু সেসা সহজ মানুষ নয়। দণ্ডের ৬৪টি চাকতিকে সরাতে যে রকম, এখানেও তাই। সেখানে যে সময় লাগে, তাতে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, আর এখানে পৃথিবীর গোলার শুধু এক বছরের নয়, এক হাজার বছরে তোলা গমের সাধ্য কি সেসার চাহিদা পূরণ করে।

বুমেরাং

সম্পাদকের দপ্তর থেকে অমনোনীত রচনা ঘুরে এলে, ফেরত এল না বলে, অনেকে বলে থাকেন, লেখাটি বুমেরাং হয়ে এল। বিশ্বাস

করি বা নাই করি, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রচলিত এই বুমেরাং শব্দটির ভাব এবং ধারণা সম্পূর্ণভাবে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ব্যবহৃত বহু প্রাচীন কালের অস্ত্র বুমেরাং থেকে আহরণ করা হয়েছে।

তীর, ধনুক, বর্শা, সড়কির মতনই বুমেরাং। কিন্তু অনেক বৈশিষ্ট্য আর বৈচিত্র্যের অধিকারী এ। তীর ছুঁড়ছি, সে তীর লক্ষ্য-ভেদ করল তো ভালই। তা না হলে হস্তচ্যুত হয়ে এগোতে এগোতে কিছুটা দূরে মাটিতে গিয়ে স্তব্ধ হবে। সড়কি, বর্শাও সে রকম। লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করুক বা না করুক হস্তচ্যুত হওয়ার পরেই সে চলে যায় নাগালের বাইরে। কিন্তু বুমেরাং সে রকম নয়। তার নির্মাণ-কৌশলের পিছনে অনেক গাণিতিক বুদ্ধি। সে যেখান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়, লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত না করতে পারলে ঠিক সেখানেই ফিরে আসে।

বহু প্রাচীন কালে গাণিতিক যুগের আদিপর্বে, যখন বিজ্ঞান উন্নত হয়নি, উন্নত কেন, যখন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়নিই বলা চলে, সে সময়ে গণিতের বহু জটিল নিয়ম-কানুনের উপর নির্ভরশীল এ জাতীয় নিখুঁত অস্ত্র সাধারণ আদিবাসীদের নৈপুণ্যে কীভাবে আবিষ্কৃত হল বিজ্ঞানীরা ভেবে অবাক হয়েছেন।

অথচ বাহাদুরির কথা এই যে, চেহারায় কোথাও জটিলতা নেই। সচরাচর সুবৃহৎ বৃত্তের ছোট চাপের মত। কিংবা আরও ভালভাবে বলা চলতে পারে, পাম্প দেওয়া সাইকেল টিউবের অংশের মত। লক্ষ্যবস্তুকে জখম করবার জন্য এ জাতীয় বুমেরাং ক্ষুরযুক্ত হয়। চ্যাপ্টা বাঁকানো ক্ষুর বুমেরাং-এর গা-ঘেঁষে বসানো থাকে। এবং সেই সঙ্গে বুমেরাংটিকে গাড়ির প্রোপেলারের মত ঈষৎ মোচড় দেওয়া হয়—এ মোচড় দেওয়ার লক্ষ্য, নির্দিষ্ট বস্তুকে আঘাত করার ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলা।

মোটামুটিভাবে বুমেরাং তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। প্রথমত, ছুঁড়বার কৌশল, দ্বিতীয়ত, বুমেরাং-এর নিজের গতি (যে গতি নির্ভর

করে বুমেরাং-এর আকৃতির উপরে) এবং সর্বোপরি বায়ুমণ্ডলের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন কালের আদিবাসীরা সাফল্যের সঙ্গে এই তিনের সমন্বয় সাধন করতে জানতো। ফলে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার চেষ্টা কোনোরকমে ফসকে গেলেও বুমেরাং হারাতো না, দূরেও যেতো না, সে নিজেই স্বস্থানে ফিরে আসতো — সুতরাং অনুমান হয়, বুমেরাং-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ঘটতো না।

বুমেরাং-এর গতিপথও বিচিত্র। যাত্রার প্রথম পর্বে সে চলে প্রায় সোজাসুজি। লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেও সম্ভবত এই পর্বেই। কিন্তু আঘাতে যে লক্ষ্যভেদ, বুমেরাং-এ তাতে গাণিতিক চাতুর্য নেই। এর আসল গাণিতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পরেই।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট বুমেরাংটি সোজাসুজি বেরিয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলের বাধা না থাকলে নিউটনের গতিসূত্র অনুযায়ী হতও তাই। বাইরের কোনো শক্তি বাধা না দিলে সচল বস্তু বরাবর চলতেই থাকবে — এটাই নিউটনের গতিসূত্র। এখানে সচল বস্তু বুমেরাং, বাইরের শক্তি বাতাস। সে বুমেরাংকে বাধা দিচ্ছে। সে বাধায় বুমেরাং-এর গতি কমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দিকও পরিবর্তিত হয়।

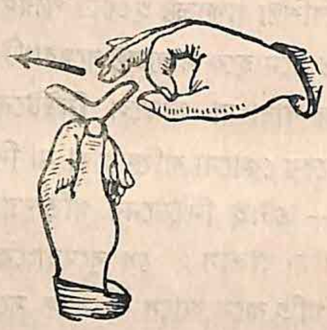
গতি কমে আসার কারণ বোঝা যায়। কিন্তু দিক পরিবর্তনের কারণ কী?

বুমেরাং-এর আকারের বৈশিষ্ট্যের জন্য বাতাস বুমেরাং-এর এক অংশের উপরে যতটা বাধা দেয়, অন্য অংশের উপরে সমপরিমাণ বাধা দিতে পারে না। বাতাসের এই অসম চাপের জন্য, বুমেরাং-এর প্রাথমিক গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসার পরে বুমেরাং সঙ্গত কারণে সহজেই দিক পরিবর্তন করতে পারে। সেই কারণেই বুমেরাং-এর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দিক পরিবর্তন করেই বুমেরাং সোজাসুজি ফিরে আসে না। সে মাটির উপরেই বার-দুই পাক খায়। তারপরে

আকারের স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রায় গোলাকার রাস্তা ধরে লক্ষ্যভ্রষ্ট বুমেরাং পূর্ব নিক্ষিপ্ত স্থানে ফিরে আসে।

বুমেরাং-এর আকার নিয়েও কৌতূহলী গাণিতিকরা প্রচুর আলোচনা করেছেন। সামান্য আকারের পরিবর্তনেই বুমেরাং-এর গতির পরিবর্তন হয় কি না তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। গতির পরিবর্তনে গতিপথও বদলায় কি না তাঁরা দেখেছেন। তা ছাড়া বুমেরাং-সংক্রান্ত আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর তাঁরা খুঁজে বেড়িয়েছেন ; বুমেরাং কোন্ পথে চলে, কীভাবে চলে, কোন্ গতিতে চলে ?

এখানে একটি ঘরোয়া বুমেরাং-এর কথা বলি। ঘরের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই এটির ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়।



চিত্রের বুমেরাং-এর চেহারার প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্যে পাঁচ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় এক সেন্টিমিটার এই মাপ ধরে পিজবোর্ড কেটে একটি বুমেরাং তৈরি করা যাক। তারপরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখে চেপে ডান হাতে বুমেরাংটিকে একটু উপর দিকে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিই। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এটি মিটার-পাঁচেক যাবে। কোনো কিছুতে ধাক্কা না খেলে তারপরে পাক খেয়ে আমারই পায়ের কাছে এসে পড়বে।

বুমেরাং-এর এই বিচিত্র গতিপথের জন্য অন্য দেশেও বুমেরাং-এর প্রচলন ঘটেছিল। ভারতবর্ষেও ছিল, মিশরেও ছিল কোথাও

কোথাও। অ্যারিজোনাতেও প্রচলন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। অ্যাসিরিয়ান যোদ্ধারাও যুদ্ধে বুমেরাং ব্যবহার করতো।

আমরা সকলেই বুমেরাং ব্যবহার করে দেখতে পারি। সম্পাদকের দপ্তর ঘুরে যে লেখা বুমেরাং-এর নজীর সৃষ্টি করে, তার নিরাশ করার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি পরিপূর্ণ ভরসা দিতে পারি, এ বুমেরাং নিঃসন্দেহে সকলকে আনন্দ দেবে।

সংখ্যা নিয়ে

সংখ্যাকে কেন্দ্র করে যে রঙ্গীন রাজ্য আমাদের চারদিকে কবে কোন্ কাল থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার বেশ অনেকগুলি বয়স সম্পর্কিত।

সরাসরি মানুষকে বয়স জিজ্ঞেস করলে স্বভাবতই সকলের সঙ্কোচের কারণ আছে। এ রকম অবস্থায় খোলা মনে সংখ্যার কৌশলের সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে যেমন একদিকে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, অপর দিকে তেমনি সঙ্কোচেরও কারণ থাকে না।

বয়স কত হল? না জিজ্ঞেস করে সঙ্গের তালিকাটি সহজেই এগিয়ে দিতে পারি। এমন কিছু নয়--সাধারণ একটি সংখ্যা চিত্র মাত্র। অথচ এটির সাহায্যে যে কারোর বয়স বিনা আয়াসেই বলে দেওয়া সম্ভব।

উপর থেকে নীচে, এই অনুসারে সংখ্যার ছয়টি স্তম্ভ পাশাপাশি সাজানো!

১	২	৪	৮	১৬	৩২
৩	৩	৫	৯	১৭	৩৩
৫	৬	৬	১০	১৮	৩৪
৭	৭	৭	১১	১৯	৩৫
৯	১০	১২	১২	২০	৩৬
১১	১১	১৩	১৩	২১	৩৭
১৩	১৪	১৪	১৪	২২	৩৮
১৫	১৫	১৫	১৫	২৩	৩৯
১৭	১৮	২০	২৪	২৪	৪০
১৯	১৯	২১	২৫	২৫	৪১
২১	২২	২২	২৬	২৬	৪২
২৩	২৩	২৩	২৭	২৭	৪৩
২৫	২৬	২৮	২৮	২৮	৪৪
২৭	২৭	২৯	২৯	২৯	৪৫
২৯	৩০	৩০	৩০	৩০	৪৬
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৪৭
৩৩	৩৪	৩৬	৪০	৪৮	৪৮
৩৫	৩৫	৩৭	৪১	৪৯	৪৯
৩৭	৩৮	৩৮	৪২	৫০	৫০
৩৯	৩৯	৩৯	৪৩	৫১	৫১
৪১	৪২	৪৪	৪৪	৫২	৫২
৪৩	৪৩	৪৫	৪৫	৫৩	৫৩
৪৫	৪৬	৪৬	৪৬	৫৪	৫৪
৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	৫৫	৫৫
৪৯	৫০	৫২	৫৬	৫৬	৫৬
৫১	৫১	৫৩	৫৭	৫৭	৫৭
৫৩	৫৪	৫৪	৫৮	৫৮	৫৮
৫৫	৫৫	৫৫	৫৯	৫৯	৫৯
৫৭	৫৮	৬০	৬০	৬০	৬০
৫৯	৫৯	৬১	৬১	৬১	৬১
৬১	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২
৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩

প্রথম স্তম্ভের মাথায় ১, দ্বিতীয় স্তম্ভে ২, তৃতীয় স্তম্ভে ৪, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তম্ভে যথাক্রমে ৮, ১৬ ও ৩২। এই পাঁচটি স্তম্ভের যে স্তম্ভে নিজের বয়স লেখা আছে, শুধু সেই স্তম্ভগুলির নাম করতে হবে। লক্ষ্য করবার মত যে, সেই উল্লিখিত স্তম্ভের মাথার অঙ্কগুলি যোগ করলেই যে যার বয়সে পেঁছে যাবে।

মনে করি, কারো বয়স ২৭। কোন্ কোন্ স্তম্ভে ২৭ উল্লেখ করা হয়েছে? প্রথম, দ্বিতীয় আর চতুর্থ, পঞ্চম। প্রথম, দ্বিতীয় স্তম্ভের শীর্ষে ১, ২, আর চতুর্থ পঞ্চমের শীর্ষে ৮, ১৬। এদের যোগফল সর্বমোট ১+২+৮+১৬ অর্থাৎ ২৭।

১ থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত যে কারোর বয়সের হিসেব এই পদ্ধতিতে এই তালিকা থেকে সহজেই বের করা যায়। আরও বেশী বয়সের ক্ষেত্রে এই জাতীয় তালিকাই সক্রিয়। তবে সেখানে এ ধরনের তালিকা দীর্ঘতর করতে হবে।

সংখ্যার আরও অনেক বৈচিত্র্য আছে।

যে কোনো একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা চিন্তা করা যাক। এবার উল্টোতে হবে সংখ্যাটাকে। এখন বড় সংখ্যা থেকে তিন অঙ্কেরই ছোট সংখ্যাটাকে বাদ দিই। বিয়োগফল যত হল, তার সঙ্গে আবার এই বিয়োফলের সংখ্যাটাকে উল্টে দিয়ে যোগ করতে হবে। যোগফল বরাবর ১০৮৯।

নির্দিষ্ট যোগফল? মনে হবে এ কেমন করে হবে? কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিন অঙ্কের যে কোনো একটি সংখ্যা নিলেই এর অর্থ বোঝা যাবে।

ধরি সংখ্যাটি ১২৩। উল্টে পাবো ৩২১। ৩২১, ১২৩-এর চেয়ে বড়। ফলে, বড় থেকে ছোট বিয়োগ করে পাওয়া যাবে ১৯৮। তাকে আবার উল্টে ৮৯১। এখন আর বিয়োগ নয় ১৯৮ আর ৮৯১ এ যোগ এবং যোগফল দাঁড়াবে পূর্বের কথা মত ১০৮৯।

সংখ্যার অনেকটা এ জাতীয় আরেকটা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করি। এটিতে যে সংখ্যাটি ভাববো, নানা হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে সে সংখ্যাটিতেই ফিরে আসব।

নিজের পছন্দমত যে কোনো একটি সংখ্যা, তাকে ৩ দিয়ে গুণ করতে হবে। যা হল তার সঙ্গে ১ যোগ, আবার ৩ দিয়ে গুণ ; এবার প্রথমে যে সংখ্যাটাকে মনে করা হয়েছিল, সে সংখ্যাটাকেই আবার যোগ করা। যোগফলের যে সংখ্যা তার এককের অঙ্ক নিঃসন্দেহে ৩। সেটা কাটি। বাকী যেটা পড়ে রইল, সেটাই প্রথম ভাবা সংখ্যা।

যদি প্রথমে ভাবি ১৭। তাকে ৩ দিয়ে গুণ করে ৫১। ১ যোগ, সম্পূর্ণ সংখ্যাটি দাঁড়াল ৫২। আবার ৩ দিয়ে গুণ, ৩ × ৫২ = ১৫৬, আবার ১৭ যোগ এর সঙ্গে ; ১৫৬ + ১৭ = ১৭৩। এখন ৩ আছে এককের অঙ্কে আর সেটি বাদ দিলে যা থাকে তাই হল নিজের সংখ্যাটি ১৭।

কিন্তু এ জাতীয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সংখ্যা নিয়ে বিচিত্র ও বিস্ময়কর এক অভিনব হিসেবের নমুনা আছে ব্যাঙ্কে টাকার লেন-দেন প্রসঙ্গে। এবারে সংখ্যার সেই হিসেবের কথাই বলব।

বেশী টাকা না নিয়ে পঞ্চাশ টাকার একটা অ্যাকাউণ্টের কথাই ধরা যাক। এই অ্যাকাউণ্ট থেকে টাকা তুলতে শুরু করলে অবস্থা যা দাঁড়ায় সেটাই এখানে লক্ষ্যণীয়।

এই ৫০ টাকার অ্যাকাউণ্ট থেকে ২৫ টাকা তুলে নিই। ফলে ব্যাঙ্কে থাকল ২৫ টাকা। যে ২৫ টাকা ব্যাঙ্কে থাকল, তা থেকে আরও ১০ টাকা তুলি। এবারে ব্যাঙ্কে থাকে ১৫ টাকা। আরও ৮ টাকা তুলে নিই এই ১৫ টাকা থেকে। এবারে বাকী থাকে ৭ টাকা। ৭ টাকার থেকে এবারে আরও ৫ টাকা তোলা হল, ব্যাঙ্কে থাকে ২ টাকা। অবশেষে সেই ২ টাকাও তুলে নিলাম।

এতক্ষণে হিসেব-নিকেশ সম্পূর্ণ হল। এবারে নিশ্চয় মানতে হবে যে, ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা তোলা হল, আর ব্যাঙ্কে যে টাকাটা ছিল, এ দুই হিসেবের পরিমাণ সমান দাঁড়াবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গোলমাল হয়।

৫০ টাকার হিসেব

ব্যাঙ্ক থেকে যা তোলা হল	ব্যাঙ্কে যা রইল
২৫·০০	২৫·০০
১০·০০	১৫·০০
৮·০০	৭·০০
৫·০০	২·০০
২·০০	০·০০
৫০·০০	৪৯·০০

স্পষ্টতঃ একটি টাকার তফাৎ দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের হিসেব-নিকেশে এ জাতীয় তফাৎ দাঁড়ানো সমীচীন নয়। এক টাকা, সে এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু টাকার পরিমাণ যদি বাড়ে। সুতরাং এর একটা ফয়সালা করা দরকার। নইলে ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার ভরসা কোথায় ?

সংখ্যার অভিনবত্ব নিয়ে আরও বহুবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। পরের যে উদাহরণটি দিচ্ছি, তা থেকে একথা নতুন করে বোঝা যাবে।

তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা ১০০ থেকে শুরু করে ৯৯৯ পর্যন্ত, ইচ্ছে মত তাকে একবার লিখতে হবে। আর নতুন কিছু হেরফেরের দরকার নেই। শুধু তিন অঙ্কের সংখ্যাটি যেখানে লেখা হল, তার পাশেই সেই সংখ্যাটিকে আর একবার লিখেছি। অর্থাৎ ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যায় দাঁড়াল প্রথমের তিন অঙ্কের সংখ্যাটি।

এখন এই সংখ্যাটির অনেক জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ৭ দিয়ে

সংখ্যাটিকে ভাগ করি, নির্ভাবনায় করি, সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে, ভাগ শেষ কিছু নেই, অর্থাৎ শূন্য। এখন ভাগফল যা দাঁড়াল তাকে আবার ১১ দিয়ে ভাগ ; হ্যাঁ, ১১ দিয়ে। এবারেও ভাগশেষ শূন্য। আর ভাগফল? ভাগফল যা দাঁড়াল এখন তাকে আবার ১৩ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অবাক হওয়ার কথা, ভাগশেষ এবারেও শূন্য। আর ভাগফল, তা অবাকের উপরে অবাক করবে। প্রথমে তিন অঙ্কের যে সংখ্যা কল্পনা করা হয়েছিল, ভাগফল এবারে তাতে এসে দাঁড়াবে।

৩ অঙ্কের কল্পিত সংখ্যা যদি ৯০৭ হয়, তাহলে ৬ অঙ্কের নির্দিষ্ট সংখ্যা ৯০৭৯০৭। উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে সংখ্যাটিকে ৭, ১১, ১৩ দিয়ে ভাগ করে দেখি, ভাগশেষ প্রতিবারেই শূন্য, আর শেষ ভাগফল যা দাঁড়াবে, তা ঐ প্রথম ৩ অঙ্কের সংখ্যা ৯০৭-ই।

সংখ্যার জগতে আরও বহুবিধ বহু বিচিত্র উদাহরণের ছড়াছড়ি। দেশে দেশে যুগে যুগে তারা ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করছে ও আমাদের অনাবিল আনন্দ দিচ্ছে।

বিচিত্র ঃ

১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ = ১১১১১১১১১

১২৩৪৫৬৭৯ × ১৮ = ২২২২২২২২২

১২৩৪৫৬৭৯ × ২৭ = ৩৩৩৩৩৩৩৩৩

১২৩৪৫৬৭৯ × ৩৬ = ৪৪৪৪৪৪৪৪৪

১২৩৪৫৬৭৯ × ৪৫ = ৫৫৫৫৫৫৫৫৫

১২৩৪৫৬৭৯ × ৫৪ = ৬৬৬৬৬৬৬৬৬

১২৩৪৫৬৭৯ × ৬৩ = ৭৭৭৭৭৭৭৭৭

১২৩৪৫৬৭৯ × ৭২ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮

১২৩৪৫৬৭৯ × ৮১ = ৯৯৯৯৯৯৯৯৯

[বাঁদিকে সংখ্যাগুলি পরপর লেখার সময়ে ৮ কিন্তু বাদ]

না, সমস্ত গণিতশাস্ত্রে শূন্যের মত শক্তিশালী আর কিছু নেই।

এ কথা ঠিক যে, যখন সে একা তখন সে অর্থহীন, তখন তার বিশেষ কোনো কৌলীন্য নেই, কিন্তু যখন সে অন্যের সহায়তায় পূর্ণতা লাভ করে, তখন সে অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তখন তার বিচিত্র কর্মনৈপুণ্য আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে। সে সময়ে শুধুমাত্র শূন্যের আঁচড়ে ৩ টাকা ৩ লক্ষ টাকায় পৌঁছে যেতে পারে, দেড় হাজার মাইল পনেরো মাইলে নেমে আসতে পারে, একটা ইঁদুরের আকৃতি হিমালয়ের আকৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে, একটা যুগ একটা সেকেণ্ডে পরিবর্তন লাভ করতে পারে।

লক্ষ্য করি, ৯০৭০ আর ৯৭, সংখ্যা দুটিতে কী ভয়ানক পার্থক্য—আর সে পার্থক্য শুধু শূন্যের সাহায্যে কত সহজেই ব্যক্ত করা চলে।

সতি সত্যিই গণিতের ইতিহাসের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শূন্য আবিষ্কারের মত মহান আবিষ্কার সমস্ত গণিতের ইতিহাসে আর একটিও হয়নি। অনস্তিত্বকে রূপদান করা ও তাকে ব্যবহারোপযোগী অসাধারণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করা সহজ কথা নয়—আমাদের আদি যুগের পূর্বপুরুষেরা সেই অসাধ্য সাধন করে গণিতের জগতে এক অতি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন।

শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার এবং প্রতীকের সাহায্যে রূপদান করার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পিঙ্গলের ছন্দ সূত্র গ্রন্থটিতে। ছন্দ সূত্রটি খৃষ্টপূর্ব সময়ের রচনা। এর পরবর্তীকালে শূন্যের ব্যবহারের ধারাবাহিক ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়, এবং যীশুখৃষ্টের সময় থেকে শুরু করে সে যুগের বিভিন্ন সময়ের গাণিতিক ও জ্যোতিষিক গ্রন্থে শূন্যের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা পায়।

বখ্শালী পুঁথি ভারতীয় গণিতের উপর একটি অতি প্রাচীন এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপি। এটি অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পেশোয়ারের নিকটবর্তী বখ্শালী গ্রামে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জীর্ণ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। গাণিতিক ঐতিহাসিকেরা এটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং এটার কাল সম্পর্কে একটি বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোন। তাঁদের অনুমান, মূল পুঁথি খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর রচনা।

পুঁথিটির প্রাপ্ত সংস্করণের পাতায় গণিতের যে সব অঙ্ক কষা আছে তা থেকে গাণিতিক ঐতিহাসিকেরা ১ থেকে ৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্ক ও শূন্যের আকৃতি লক্ষ্য করেন।

পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত শূন্যের রূপ কিন্তু এ যুগের ব্যবহৃত শূন্যের মত নয়। বখ্শালী পাণ্ডুলিপিতে শূন্যের জন্য বিন্দু চিহ্নটিকে (.) গ্রহণ করা হয়েছে।

এই বিন্দু চিহ্নের সাহায্যে শূন্যকে প্রকাশ করার রূপটি ঐতিহাসিকদের হস্তগত শূন্যের প্রাচীনতম রূপ। তার পূর্ববর্তী যুগে শূন্যের কি রূপ ছিল তা আজও জানা যায়নি। এমন হতে পারে যে, আদিতে শূন্যকে এই বিন্দুর সাহায্যে ব্যক্ত করা হত, আবার এও হওয়া অসম্ভব নয় যে, শূন্যের সৃষ্টিতে তাকে ভিন্নভাবে ব্যক্ত করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তবে সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয় যে, আদিতে শূন্যের রূপ বিন্দু হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি সুবন্ধু তাঁর 'বাসবদত্তা' কাব্যে শূন্য অর্থে 'শূন্য-বিন্দু' কথাটি ব্যবহার করেছেন। শূন্য-বিন্দুর পরবর্তী যুগে শূন্যকে বিন্দুর পরিবর্তে বৃত্তের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। শূন্য অর্থনির্দেশক বিন্দু ঠিক কবে বৃত্তাকারে পরিবর্তিত হল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোনো সময়ে এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

দ্বিতীয় জৈবর্ধনের রঘোলি লিপি এবং ভোজদেবের রাজত্বকালের

গোয়ালিয়রের খোদাইয়ে শূন্য অর্থবোধক বৃত্তাকার চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রঘোলি লিপি অষ্টম শতাব্দীর রচনা, গোয়ালিয়রের খোদাই তার পরবর্তী যুগে নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। গোয়ালিয়র লিপিতে ৫০ এবং ২৭০কে বৃত্তাকার শূন্যের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

হিন্দু শূন্যের সঙ্গে গণিতের দশমিক পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাস্তবিক শূন্যের আবিষ্কার না হলে দশমিক নিয়মে সংখ্যা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করাই কোনোদিন সম্ভব ছিল না। একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি — দশমিক পদ্ধতির এইসব বিভিন্ন স্থানের প্রতিটি স্থানের সঙ্গে পরবর্তী স্থানের সম্পর্ক দশ দিয়ে গুণ করেই আনা সম্ভব। তা ছাড়া দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যাতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মাত্র এই ন'টি অঙ্ক ও শূন্যের সাহায্যে অতি বৃহৎ যে কোনো অঙ্ককে সহজেই প্রকাশ করা চলে।

হিন্দু দশমিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন শুরু হওয়ার পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছোট বড় বিভিন্ন সংখ্যাকে নির্দেশ করার যে সব জটিল ও অবৈজ্ঞানিক পন্থা প্রচলিত ছিল তাদের সবগুলির তুলনায় হিন্দু পদ্ধতি সর্বাংশে শ্রেয়। হিন্দু পদ্ধতি ছাড়া সে যুগের অন্য কোনো পদ্ধতি সুষ্ঠু ও সংহত ছিল না — ফলে হিন্দু পদ্ধতিতে যেমন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ন'টি অঙ্ক ও শূন্যের সাহায্যে বিভিন্ন বৃহৎ সংখ্যাও নির্দেশ করা সম্ভব হত, অন্য কোনো পদ্ধতির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। অন্যান্য পদ্ধতিতে সে কারণে বিভিন্ন বৃহত্তর অঙ্ক নির্দেশ করবার সময়ে বিভিন্ন চিহ্নের প্রয়োজন দেখা দিত কিন্তু বৃহত্তর অঙ্কের শেষ নেই, সেইজন্যে চিহ্নের সংখ্যাও সীমিত হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংখ্যা সংক্রান্ত এই অসুবিধের জন্যে অতি বৃহৎ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা সে যুগে কোনো দেশের কোথাও পূর্ণতা পায়নি।

হিন্দু শূন্য ও হিন্দু দশমিক পদ্ধতি তার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এই পদ্ধতি তার

সগৌরব দিগ্বিজয় যাত্রায় সর্বপ্রথম যায় তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্যে। সে প্রায় খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর কথা। সেখানে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পর শূন্য সংবলিত হিন্দু পদ্ধতি যায় ইউরোপে। সে আবার খৃষ্টীয়



বখ্শালী পুঁথিতে ব্যবহৃত ১ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্ক ও শূন্যের রূপ

দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। এখানেও সে সমাদরে গৃহীত হল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী এবং সমসাময়িক কোনো কোনো রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে এ পদ্ধতির ব্যবহার ও উল্লেখ লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই তা বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করল।

শুধু হিন্দু সংখ্যা, সংখ্যা লিখন-প্রণালী বা শূন্যকে গ্রহণই সব নয়, ইংরেজীতে শূন্যবোধক যে Zero শব্দটি প্রচলিত আছে তাও এই শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইংরেজী 'Cipher' শব্দটি শূন্যের আরবী রূপ 'সিফ্‌র্' থেকে এসেছে, আর 'সিফ্‌র্'-এর ইটালীয় রূপ Zepiro থেকে Zero শব্দটি জন্মলাভ করেছে।

শূন্যের এই বিশ্ব পরিক্রমার পরে আবার স্বদেশে ফিরে আসি, আলোচনা যা দিয়ে শুরু করেছি সেই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে আলোচনা শেষ করি।

খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর বিভিন্ন গ্রন্থে, আর্যভটের আর্যভটীয়, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা প্রভৃতিতে বিভিন্ন অঙ্কের বেলায় অর্থযুক্ত প্রতীক শব্দের ব্যবহার হত। শূন্যের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। শূন্যের আকৃতিগত বা আঙ্কিক যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, তা এই অর্থযুক্ত প্রতীক শব্দের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়।

প্রতীক শব্দগুলি হল : আকাশ, অনন্ত, পূর্ণ, রন্ধ্র, গগন, ব্যোম, খ, নভ প্রভৃতি।

ভারতীয় গাণিতিকেরা যেখানে শূন্যকে শব্দে রূপান্তরিত করতেন, সেখানে শূন্যবোধক এই জাতীয় শব্দগুলি ব্যবহার করতেন। আকাশ

নিরাকার, শূন্যও তাই। কিংবা এমনও হতে পারে, যে বিস্তীর্ণ আকাশ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, সে বৃত্তাকার, শূন্যও বৃত্তাকার। আকাশ পর্যায়ে গগন, ব্যোম, খ, নভ প্রভৃতি শব্দও সেই কারণে শূন্যকে নির্দেশ করে।

রন্ধ্র অর্থ ছিদ্র। অতি সংক্ষিপ্ত আকৃতিতে তাকে বিন্দুর মত কল্পনা করা চলতে পারে। অনন্ত এবং পূর্ণের সঙ্গেও শূন্যের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

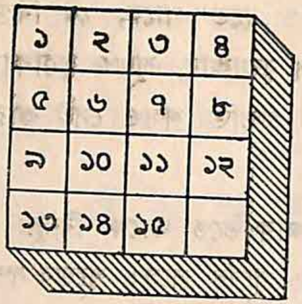
ভারতীয় গণিতের শূন্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এখনও গাণিতিক ঐতিহাসিকেরা বের করতে পারেন নি। শূন্য কে বা কারা আবিষ্কার করেন, সঠিক কবে তা আবিষ্কৃত হয়, কী আকৃতিতে তাকে ব্যক্ত করা হয়, এ তথ্য আজ এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। কিন্তু তাতে আপশোসের কোনো কারণ নেই। কে, কবে, কী আবিষ্কার করলেন — এর চেয়েও বড় কথা সে আবিষ্কারে আমরা কতটুকু লাভ করলাম। হিন্দু গণিতের শূন্যের বেলায় লাভের পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের কারোর মনেই সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

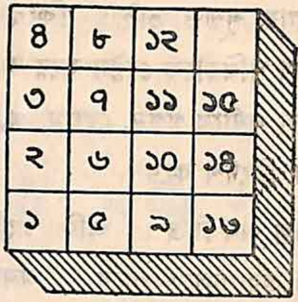
ঘর বদল

একটা কাঠের ঘেরা বাক্সের মধ্যে ১৫টি স্বতন্ত্র কাঠের ব্লক আছে। ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত সংখ্যা বসানো এক একটি, সাজানো আছে পরপর, শুধু শেষেরটি ফাঁকা।

কোনো ব্লক একেবারে বাক্স থেকে তুলে নিয়ে অন্য ঘরে বসানো চলবে না। শুধু ফাঁকা ঘরের সাহায্য নিয়ে একচালে একটা করে ব্লক ঠেলে ছবিতে যেমন নির্দেশ, তেমনি করে সাজাতে হবে।

কেমন করে সাজানো হবে?





কম করে ৩৯টা চাল দিতে হবে।

১৫, ১৪, ১০, ৬, ৭, ১১, ১৪, ১০, ১৩, ৯, ৫, ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২, ১৫, ১০, ১৩, ৯, ৫, ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২, ১৫, ১৪, ১৩, ৯, ৫, ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২।

ধাঁধায় চাকরি আরামের?

কোয়ালিফিকেসন ছিল, ইণ্টারভিউটা জুটে যাবে জানা কথা।

ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, কী মাইনে পেলে আসা সম্ভব?

ইণ্টারভিউয়ের আগে খোঁজ খবর নিয়েছিলাম। দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব আছে আফিসের বিভিন্ন সেক্সানে। সব কিছু জিজ্ঞেস করে-ছিলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্র্যাক্টিক্যাল লোক, আফিসের কায়দা-কানুন, আদব-কেতাব, হাল-চাল জেনে রাখা ভাল আগে থেকে। চাকরিতে জয়েন করবার পরে মনস্তাপ করে লাভ নেই কোনো।

আফিস নয়, মিলিটারি ক্যাম্পের মত কড়া ব্যবস্থা। বন্ধুরা কেউ উৎসাহ দেয়নি। অসম্ভব, মানুষের কর্ম নয় এখানে চাকরি করে। সকাল ন'টা থেকে ডিউটি শুরু, ন'টা মানে ন'টাই, পাঁচটা মিনিট লেট হবার উপায় নেই — ট্রামের কারেণ্ট ফেল করুক, বাসের টায়ার যাক, রাস্তায় গুলি চলুক—ঠিক সময়ের মধ্যে আফিসে পেঁাছোতেই হবে।

আজকালকার দিনে পথে-ঘাটে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি গিজগিজ করছে, জীবন হাতে চলাফেরা, দৈব-দুর্ঘটনা তো আছে, কখন কী হয় কিছু বলা যায় না, সেখানে কয়েকটা মিনিট লেট এমন কিছু ব্যাপার নয়। সেটুকু হবারও উপায় নেই। কোনো কৈফিয়ৎ তলব নয়, লাল কলমের এক আঁচড়ে একদিনের ক্যাজুয়াল লীভ বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে ছুটি নেওয়া ভাল।

অথচ স্কেলের দিকে তাকিয়ে লোভ হয়। যদি ভাগ্যে জুটে যায় তো লোকের হিংসে করার মত। থাক নিয়ম-শৃঙ্খলার কড়া বাঁধুনি, এই তো বয়স! এই বয়স থেকে কাজে মন দেওয়ার বদলে ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেস আরম্ভ করলে ভবিষ্যতে হাই তোলা ছাড়া আর কোনো কাজেই উৎসাহ থাকবে না। সেটা একেবারে কাজের কথা নয়। অথচ এদিকে সাজ্ঘাতিক কাজের চাপ। ফলে মাইনেটা মনের মত না হলে চলবে কেন? তাছাড়া এই দুর্মূল্যের বাজারটাও একবার দেখতে হবে। জিনিষপত্তরের দাম কি রকম চড়চড় করে বেড়ে চলেছে। সেখানে ভাল মাইনে না পেলে চাকরি নেওয়ার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।

আমি বললাম, সাতশো টাকা।

ম্যানেজার যেন আকাশ থেকে পড়ল। সাতশো! মাসে সাতশো টাকা। বছরে বারো মাস, তাতে কত টাকা হয় সে খেয়াল আছে?

সাধারণ গুণ। অসুবিধে নেই কোথাও। সাত বারোয় চুরাশি। তার পিছনে দুটো শূন্য বসিয়ে দিলে এক বছরের মাইনে। আট হাজার চারশো টাকা। ৩৬৫ দিনে আট হাজার চারশো টাকা। সে হিসেবে রোজ তেইশ টাকা। এমন কী আর? আমি নিজের হয়ে ওকালতি করতে শুরু করলাম।

আমি উকিল হলে ম্যানেজার ব্যারিস্টার। বললে, ৩৬৫ দিনে ক'টা দিন কাজ করতে হয় সে হিসেব করেছেন কখনও?

শুভঙ্করের ধারাপাতে কড়া গণ্ডার হিসেব। ম্যানেজারের ধারাপাতে সারা বছরের হিসেব। সেই হিসেব আউড়ে গিয়ে ম্যানেজার ভেল্কি দেখিয়ে দিল।

রোজ আট ঘণ্টা ঘুমোন তো? রাত দশটা থেকে সকাল ছ'টা। কত হল, আট ঘণ্টা। ঘুমোন কি'না?

তা তো বটেই, তা তো বটেই। রোজ আট ঘণ্টা না ঘুমোলে শরীর থাকবে কেন?

চব্বিশ ঘণ্টায় দিন। আট ঘণ্টা ঘুমোনো মানে সম্পূর্ণ দিনের তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমিয়ে কাটান। বছরে ৩৬৫ দিন, তাতে সবশুদ্ধ কতদিন ঘুমোন বের করা কঠিন কী আর? দিনের তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমোলে বছরেও তিন ভাগের এক ভাগ, কত হয় তা? ১২২ দিন। আট ঘণ্টা ঘুম ছাড়াও আফিসের বাইরে আরও সময় কাটে। সকাল ছ'টা থেকে ন'টা আর বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা। পাঁচ, তিন আট ঘণ্টা। ঘুমোনো বাদেও দৈনিক আরও আট ঘণ্টা আফিসের বাইরে কাটাচ্ছেন। আরও ১২২ দিন আগের মত। কত হল সবশুদ্ধ? একশো বাইশে আর একশো বাইশে দু'শো চুয়াল্লিশ দিন। বছরে দু'শো চুয়াল্লিশটা দিন বাইরেই কেটে যাচ্ছে। ৩৬৫-এর ক'টা দিন বাকি থাকে আর? ১২১ দিন।

আমি অবাক, মাত্র এই ১২১ দিন কাজ করতে হয়?

ম্যানেজার বললে, তাও হয় না। এই ১২১ দিনও আপনাকে কাজ করতে হয় না। ৫২টা রোববার বছরে। আরও ৫২টা দিন বেরিয়ে গেল। কত রইল, ৬৯। আরও আছে। শনিবারে হাফ। রোববার পুরো ছুটির জন্যে ৫২ দিন হ'লে হাফের জন্যে ২৬ দিন। ৬৯ থেকে ২৬ গেল। কত থাকে? মাত্র ৪৩ দিন। তবু এই ৪৩ দিন কাজ করলে বোঝা যেত। ছুটি-ছাটার কি আর শেষ আছে কখনও? সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজো, কালী পুজো। তাছাড়া ১৫ আগস্ট, ২৩ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস। দোলে ছুটি, বছরের শুরুতে, শেষে,

বড়দিনে। গুড্ ফ্রাইডে, ইস্টার স্যাটারডে। কম করে ১৫টা দিন তো যায় এসব থেকে। তা হ'লে থাকে মাত্র ২৮টা দিন। তারপরে ক্যাজুয়াল লীভ বারোটা। শরীর খারাপ হ'তে পারে। মেডিক্যাল লীভ পনেরোটা সেই জন্যে। আর ছুটি পাওনা থাকলে কে ছাড়ে বলুন? বছরে মাত্র একটা দিনের জন্য কাজ করতে হয় আপনাদের।

আমি তো অবাক।

ম্যানেজার বললে, কাজেই সাতশো চাইবেন না। পাঁচশোতে জয়েন করুন। আমি আপনাকে আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিচ্ছি।

বিচারের গল্প

কত বিচিত্র আঙ্গিক, অভিনব পরিকল্পনায় গণিতের ব্যবহার চলেছে নানা আখ্যান উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে সব দেশের, সব কালের, সব সমাজের সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে, ভাবলে বিস্ময়বোধ করার কথা।

গাণিতিক সোনার কাঠির ছোঁয়ায় কত রূপকথা, কত ঐতিহাসিক উপাখ্যান, ছোটদের, বড়দের বিভিন্ন জাতীয় কত বিচিত্র কাহিনী সজীব হয়ে উঠেছে, বিশেষ রূপ পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

রাজা-রাজড়ার দিন আর নেই। জমিদার নায়েবের যুগও পার হয়ে এসেছি আমরা। এখন মফঃস্বল শহরে শহরে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলতে একমাত্র সাব-ডেপুটি। কিন্তু গ্রাম যেখানে আরও গভীরে, সেখানে বিপদে-আপদে প্রয়োজনে-পরামর্শে গ্রামের মোড়লই যথেষ্ট। তার যুক্তিই লোকে শোনে, তার পরামর্শে সবাই কাজ করে, তার আদেশই লোকে মাথা পেতে নেয়।

সাঁওতাল পরগণা জেলার এইরকম একটি গ্রাম। এইরকম একটি গ্রামের মোড়ল। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক। বিবেচকও বটে। অর্থাৎ যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি। শীতের এক সকালে সেই লোকটির বাড়ির বাইরের উঠোনে এ কাহিনীর প্রথম পর্ব।

সাকরেদ দয়ারাম এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মধুর সকাল। উত্তরের বাতাস আর নবীন রবি মেধীরাম মোড়লের উঠোনে এসে ধরা পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মেধীরাম তামাক টানছিল আপনমনে। আর মাঝে মাঝে গোঁফে মোচড় দিচ্ছিল।

দয়ারামকে দেখে হুঁস হোল। জিগ্যেস করলে, কী খবর?

খবর গুরুতর হলে পরিবেশনের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। চোখে কিছুটা চাঞ্চল্য আর সাফল্যের দীপ্তি এনে ঘন হয়ে বসে দয়ারাম মৃদু হাসল।

সে হাসিতে মেধীরামের কাছে বিষয়টা আংশিক পরিষ্কার হল। কিন্তু আংশিকে মন খুশী হয় না। বাকিটুকু জানবার জন্যে মেধীরাম ঔৎসুক্য দেখাল।

দয়ারাম উঠোনে জাঁকিয়ে বসে ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করল ধীরে ধীরে।

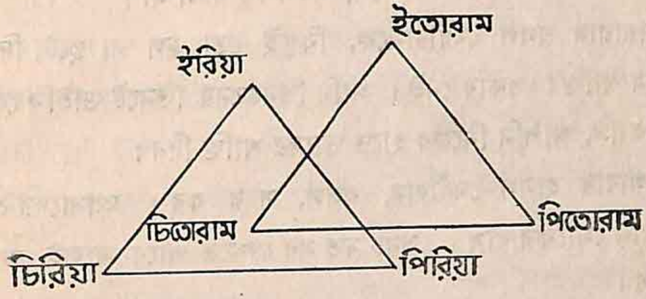
এ কাহিনী একটি গ্রামের তিনটি বউকে নিয়ে। তিনটি বউয়ের নাম ইরিয়া, চিরিয়া, পিরিয়া। কোন্ স্ত্রীর কোন্ স্বামী? ইরিয়ার স্বামীর নাম ইতোরাম, চিরিয়ার চিতোরাম, আর পিতোরাম পিরিয়ার স্বামীর নাম।

গ্রামের এই তিনটি বউকে নিয়েই যত গোলমাল। এরা আসলে মানুষ নয়, ডাইনি। গ্রামের সবাই সে কথা জানে। শুধু প্রত্যেকের আপন কর্তাটি ছাড়া। ইরিয়া যে ডাইনি গ্রামের আর সব স্ত্রী পুরুষই তা শুনেছে, চিতোরাম আর পিতোরামও। বাদ কেবল ইতোরাম। চিতোরাম আর পিতোরামের বেলাতেও সে রকম। চিতোরামের ডাইনি বউয়ের কথা চিতোরাম ছাড়া সবাই জানে।

পিতোরামও তার ডাইনি বউয়ের কথা জানে না। কিন্তু গ্রামের আর কার সে কথা শুনতে বাকি আছে?

দয়ারাম সব বুঝিয়ে বলল।

মেধীরাম হুঁকোয় টান দিতে দিতে ঘাড় নাড়ল।



কাহিনীর আখ্যানপর্বের উপরে যবনিকা টেনে এবারে আমরা এগিয়ে যাব।

সাঁওতাল পরগণার এই গ্রামটিতে মোড়লই আইন, মোড়লই আদালত। আর সে বড় সোজা লোক নয়। গ্রামের লোকেরা বুদ্ধিমান, তাই জন্যে অভিনব এবং বিচিত্র শাস্তির ব্যবস্থা করল সে। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সে শাস্তির কথা প্রচার করা হল সেই গ্রামটির এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে।

গ্রামে ডাইনি স্ত্রী আছে। যারা ডাইনি তাদের স্বামীদের আদেশ দেওয়া হচ্ছে ঢ্যাঁড়ায়। নিজের নিজের স্ত্রীকে হত্যা কর। কিন্তু শুধু সন্দেহের বশে মারা চলবে না, মারবার আগে স্ত্রী যে ডাইনি সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হবে।

গ্রামের সবাই তা শুনে শিউরে উঠল। অবাকও হল অনেকে। স্ত্রীদের নাম বলা নেই, ধাম উল্লেখ করা নেই। স্বামীদের পরিচয় নেই। কজন স্ত্রী তার সম্পর্কেও কোনো কথা নেই। কী করে, কী হিসেবে সেই স্বামীরা আপন আপন ডাইনি স্ত্রীর কথা বুঝতে পারবে?

দয়ারাম মেধীরামকে বললে, এ কী রকম হেঁয়ালিভরা শাস্তি।

মেধীরাম হাসল, হেঁয়ালি শুধু খোলসটাতে। একটু তলিয়ে দেখ। গাণিতিক নিয়মে সব বেরিয়ে আসবে একের পর এক।

ঢ্যাঁড়া পিটোনোর পরে একটা রাত্তির কেটে গেল। না, কোনো খবর নেই কোনোদিকে।

দ্বিতীয় রাত্তিরও গেল। সেদিনও কিছু ঘটল না।

দয়ারাম বলল মেধীরামকে, কিছুই তো হল না দুটো দিনে। এরকম শাস্তির দরকার নেই। আমি তিনজনের তিনটে ডাইনি বৌকে ধরে আনি, আপনি নিজের হাতে তাদের শাস্তি দিন।

আবার হাসল মেধীরাম, বলল, সবুর কর। আমাদের গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের বাস। সময় মত সব দেখতে পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

তা সময় এল তৃতীয় দিন রাত্তিরে। সে রাত্তিরে তিনটে খুন হল গ্রামটিতে। ইরিয়া খুন হল তার স্বামী ইতোরামের হাতে। চিরিয়া আর পিরিয়া খুন হল চিতোরাম আর পিতোরামের হাতে।

তিনটি স্ত্রীলোকের বদলে আমরা এক একটি স্ত্রীলোক নিয়ে আলোচনা শুরু করি। ধরা যাক, গ্রামে একটিমাত্র ডাইনি স্ত্রী আছে আর সেটি ইরিয়া। তাহলে ইরিয়ার স্বামী ইতোরাম ছাড়া গ্রামে আর সবাই এই কেলেঙ্কারীর কথা জানবে। এখন মোড়লের ঢ্যাঁড়া শুনে ইতোরাম কী ভাববে? ঢ্যাঁড়ায় গ্রামে ডাইনি স্ত্রী আছে, এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যের স্ত্রী ডাইনি হলে ইতোরাম তা জানবে, এ কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে নিজের স্ত্রী ডাইনি বলে কোনো কথাই ইতোরামের কানে আসবে না। অর্থাৎ গ্রামে এ জাতীয় কোনো স্ত্রী আছে তাই সে জানবে না। কাজেই মোড়লের ঢ্যাঁড়ায় তার টনক নড়বে। তাই নিজের বউ ডাইনি হলে সহজেই সে বুঝতে পারবে। আর শুধু আশঙ্কার উপরে ভর করে নয়, গাণিতিক যুক্তি দিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে প্রথম রাত্তিরেই মোড়লের আদেশে তাকে সে খুন করবে।

কিন্তু গ্রামে তো আর একটিমাত্র নয়, একাধিক স্ত্রী ডাইনি অর্থাৎ এমন একজনও পুরুষ নেই যে কোনো ডাইনি স্ত্রীর কথা জানে না। অর্থাৎ গ্রামের প্রতিটি পুরুষ কোনো না কোনো ডাইনি স্ত্রীর কথা জানে। কাজেই প্রথম রাত্তিরে খুন করার কথা ওঠে না।

এবার ধরা যাক, গ্রামে দুজন ডাইনি স্ত্রী আছে। ইরিয়া আর চিরিয়া। মোড়লের ঢ্যাঁড়া পেয়ে ইতোরাম ভাববে যে প্রথম রাত্তিরেই চিরিয়া খুন হবে চিতোরামের হাতে। আর চিতোরামেরও ঠিক উল্টোটি মনে হবে। তার মনে হবে যে, প্রথম রাত্তিরেই ইরিয়া খুন হবে ইতোরামের হাতে।

এদের এ ভাবনার পিছনে সঙ্গত কারণও আছে। ইতোরাম জানে গ্রামে একমাত্র চিতোরামের বউ ডাইনি, আর চিতোরামও সেই রকমই জানে ইতোরামের বউয়ের কথা। আর গ্রামে একটিমাত্র ডাইনি থাকলে প্রথম রাত্তিরেই সে তার স্বামীর হাতে নিহত হবে।

কিন্তু প্রথম রাত্তিরে কেউ খুন না হওয়ায় ইতোরাম বুঝলে, গ্রামে চিতোরামের বউ বাদে আরও নিশ্চয় কেউ ডাইনি আছে। আর যেহেতু আর সে দ্বিতীয় কারোর কথাই জানে না, কাজেই দ্বিতীয় ডাইনিটি তার নিজের বউ ইরিয়া নিঃসন্দেহে। চিতোরামও বুঝতে পারল যে, ইতোরামের বউ বাদে গ্রামে আরও নিশ্চয় কেউ ডাইনি আছে। এবং দ্বিতীয় কারো কথা না জানায় সেটি তার নিজের বউ চিরিয়াই হতে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে তারা নিজের নিজের বউয়ের চরিত্রের কথা বুঝতে পারবে। আর গ্রামে দুজন ডাইনি থাকলে দ্বিতীয় রাত্তিরেই তারা নিজেদের স্বামীদের হাতে প্রাণ হারাবে।

কিন্তু গ্রামে তো আর দু'জন নয়, দুজনের বেশী অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনজন স্ত্রীলোক আছে। অর্থাৎ এমন একজনও পুরুষ নেই গ্রামে যে মাত্র একজন ডাইনির কথা জানে। সেইজন্যে দ্বিতীয় রাত্তিরেও কেউ খুন হল না।

এবারে সকলের কথায় আসা যাক, ইরিয়া, চিরিয়া, পিরিয়া এদের তিনজনের কথা।

এখন ইতোরাম চিরিয়া আর পিরিয়ার কথা জানে। চিতোরাম জানে ইরিয়া আর পিরিয়ার কথা। পিতোরাম জানে ইরিয়া আর চিরিয়ার কথা। অর্থাৎ প্রত্যেকেই অপর দুজনের স্ত্রীর কথা জানে। এখন দ্বিতীয় রাত্তিরে পিতোরাম ভাবছে যে, গ্রামে তো দুটি ডাইনি স্ত্রী আছে। অতএব এরা দুজনেই দ্বিতীয় রাত্তিরে এদের স্বামীদের হাতে মারা পড়বে। ইতোরাম আর চিতোরামের চিন্তাও এরই মতন। ইতোরাম চিরিয়া আর পিরিয়ার মৃত্যুর কথা ভাবছে আর পিতোরাম ভাবছে ইরিয়া আর চিরিয়ার মৃত্যুর কথা।

এখন দ্বিতীয় রাত্তিরেও যখন কেউ মারা পড়ল না তখন ইতোরাম, চিতোরাম আর পিতোরাম প্রত্যেকেই বুঝলে যে, গ্রামে দু'জনের বেশী ডাইনি আছে। আগে শুধু ইতোরামের কথাই বলি। তাহলে চিতোরাম আর পিতোরামের কথা বুঝবার সুবিধে হবে। এখন ইতোরাম শুধু চিরিয়া আর পিরিয়ার কথা জানত। গ্রামে শুধু এই দুজন ডাইনি থাকলে দ্বিতীয় রাত্তিরেই এরা নিহত হত। এখন দ্বিতীয় রাত্রি ভালোয় ভালোয় কাটলে ইতোরাম বুঝবে যে, গ্রামে আরও ডাইনি আছে। চিরিয়া আর পিরিয়া ছাড়া অন্য কেউ থাকবে যার কথা ইতোরাম জানে না। সেই তৃতীয়টি তার নিজের স্ত্রী ইরিয়া হওয়াই একমাত্র সম্ভব। ঠিক এইভাবে চিতোরাম আর পিতোরাম নিজের নিজের স্ত্রীর স্বরূপটি চিনতে পারবে। কাজেই মোড়লের ঢ্যাড়ার প্রতি সম্মান রেখে তৃতীয় রাত্তিরে ইরিয়া, চিরিয়া আর পিরিয়া নিজের নিজের স্বামী ইতোরাম, চিতোরাম আর পিতোরামের হাতে নিহত হবে।

অভিনব এবং বুদ্ধিযুক্ত নিখুঁত গাণিতিক বিচার।

আজকাল বুদ্ধির যুগ এবং গণিতও অনেক উন্নত। এ যুগে এ জাতীয় বিচার প্রবর্তন করলে কেমন হয়?

তাস, লাক-ট্রাই এবং জুয়াখেলা

জুয়া খেলা এবং ভাগ্য পরীক্ষার যত বৈচিত্র্য তেমন আর কিছুতে নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সে খেলার আসল কৌলীন্য তাসকে নিয়ে।

তাসের প্যাকেট, তাতে ৫২টা তাস। সংখ্যার বাহুল্যে এবং তাসের বিভিন্নতায় খেলার অনিশ্চয়তা বাড়ে — খেলা সার্বজনীনতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। সেদিক দিয়ে ৫২টা তাস কম নয়। তার চার রং —প্রতি রংয়েই তেরটি জাত — সেই-ই তাসের সমস্ত অবলম্বন।

তাসের জুয়ার জাত খেলা হল 'তিন তাস'। ৫২টা তাস, তার মধ্যে তিন তাস। অর্থাৎ প্রতি দানে প্রত্যেকের ভাগ্যে তিনটি মাত্র তাস। সেখানে কত রকমের বৈচিত্র্য সম্ভব? যত রকমের বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাব সাধারণ হিসেবে সংখ্যায় তা হল ২২১০০। তার অর্থ ৫২টা তাসের ভেতর থেকে মিলিত তাসের যত বিভিন্নতা সংখ্যায় তা ২২১০০।

বিভিন্নতার ভেতর দিয়েই সম্ভাবনার সূত্র। পয়সা নিয়ে টস করার বেলায় বিভিন্নতা দুই, এক হেড আর এক টেল। ফলে দু'বার টস করলে একবার হেড হবার সম্ভাবনা, একবার টেল। তিন তাসের বেলাতেও সেরকম, সেখানে তাসের বিভিন্নতা যদি ২২১০০ হয়, তা হলে ২২১০০ দান তাস দিলে প্রত্যেকের ভাগেই সমস্ত বৈচিত্র্য একবার করে আসার সম্ভাবনা।

এই সম্ভাবনা এবং তার মাত্রাকে গাণিতিকেরা সূত্রের সাহায্যে নির্ধারিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, যদি কোনো ঘটনা ক-সংখ্যক পদ্ধতিতে ঘটবার সম্ভাবনা থাকে, এবং সর্বমোট পদ্ধতি খ হয়, তা হলে ক/খ হল সম্ভাবনার মাত্রা। এই মাত্রা ধরে

তিন তাসের সবচেয়ে বড় কুলীন তিন টেক্কা পাওয়ার সম্ভাবনা হিসেব করা যাক।

সর্বমোট ৫২টা তাস। বিতরণ করা তিনটে তাসের তিনটেই টেক্কা হবে এটা বড় সহজ কথা নয়। ৫২টা তাসের ভেতর থেকে তিনটে করে তাস দেওয়ার সর্বমোট যে পদ্ধতি, তার সংখ্যা ২২১০০, সে কথা পূর্বে বলেছি। আর টেক্কার সংখ্যা ৩ নয়, ৪। ফলে ৪টে টেক্কার ভেতর থেকে তিনটে টেক্কা চারভাবে পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং ৫২টা তাসের ভেতর থেকে তিনটে তাস নিলে ৩টেই টেক্কা হবার সম্ভাবনা ৪/২২১০০ অর্থাৎ ৪/৫৫২৫। সরল ভাষায় বলতে গেলে ৫৫২৫ দান খেললে একবারই মাত্র তিনটে টেক্কা কপালে জোটার সম্ভাবনা থাকে।

শুধু তিনটে টেক্কা নয়, তাসের জুয়ায় তিন রংয়ের একই তাস পাওয়ার সম্ভাবনা তিন টেক্কারই অনুরূপ।

কিন্তু বাস্তবে যাঁরা তাস খেলতে বসেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা সব সময়ে গণিতের নিয়ম অনুসরণ করে চলে না। খেলার প্রথম পঞ্চাশ দানের মধ্যে কেউ যদি তিনবার তিন টেক্কা পাওয়ার কথা বলেন, তা হলে অবাক হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে, কিন্তু গণিতের নিয়মে অসম্ভব এমন মতামত ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়। সঙ্গত নয় এই কারণে যে, গাণিতিক সম্ভাবনা সম্ভাবনাই মাত্র, তার কোনো নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট চেহারা নেই। তা হলে এভাবে সম্ভাবনা নিরূপণের অর্থ ই বা কী এবং এর সার্থকতাই বা কোথায়? অর্থ একটা আছেই এবং সে অর্থ মূল্যহীনও নয়।

সম্ভাবনার সমস্ত পর্যায়গুলির মধ্যে একটি বিশেষ চাল কতবার দেখা যাচ্ছে, সম্ভাবনার মাত্রার ক্ষেত্রে ন্যূনতম হিসেবে তা পরিস্ফুট। কিন্তু ন্যূনতম হিসেবের সঙ্গে বাস্তবে সচারাচর মিল দেখা যায় না। ন্যূনতম হিসেবকে যখন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়, এবং সে বৃদ্ধি

যখন লক্ষ-নিযুত-কোটির অঙ্ক ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই এর যাথার্থ্য বুঝতে পারি।

এ শুধু তিন তাসের খেলায় তিনটি টেক্কা বা তিনটে এক রংয়ের তাস নিয়ে নয়, রানিং ফ্ল্যাশ, রান, কালার — বিভিন্ন পর্যায়েই সম্ভাবনার মাত্রা এইভাবে মিলিয়ে নেওয়া চলতে পারে।

তিন তাসের খেলায় কৌলীন্য হিসেবে যে ধারাবাহিকতা — ট্রায়ো রানিং ফ্ল্যাশ, রান, কালার—তা নিঃসন্দেহে গণিতভিত্তিক। সম্ভাবনায় যার প্রাপ্তি যত কম, কৌলীন্যে সে তত উপরে। এই হিসেবে তিন তাসের খেলায় ট্রায়োর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তার পরে আসে রানিং ফ্ল্যাশ, রান, কালার।

তাস ছাড়া জুয়ার আরও অনেক অবলম্বন আছে। ঠিক এই শহরের পথে-ঘাটে আমার নজরে আসেনি, কিন্তু কালীপুজোর সময়ে মফঃস্বলের অনেক টাউনে খোলা রাস্তার উপরেই এই খেলার পশরা নিয়ে আসর জমাতে দেখেছি। সে আসর জমানো হয় বোর্ড পেতে। দাবার আকারের বোর্ড, কিংবা আকৃতিতে তার চেয়ে একটু বড়। তাতে ছ'টি ঘর, ছ'টি চিহ্নবিশিষ্ট — এই ছ'টি চিহ্ন, লুডোর ছক্কার মত এক বড় ছক্কার ছ'টা পিঠে নির্দিষ্ট। এখন এই ছক্কার এক এক চালের সঙ্গে জুয়োর এক এক দান।

বোর্ড পেতে এই জাতীয় জুয়োর সঙ্গে তিন তাসের আসরের মূলগত একটা পার্থক্য আছে। পাতা বোর্ডে ছক্কা চালার সঙ্গে সঙ্গে ছ'টি ঘরের যে কোনো একটিতে যে কেউ নিজের ইচ্ছেমতো টাকা রাখবে। খেলার নিয়মে যদি ছক্কার চাল ওই ঘরের চিহ্নযুক্ত বৈশিষ্ট্যেরই নির্দেশ করে, তা হলে যে অর্থ কোনো খেলুড়ে ওই ঘরে ধরবে সে অর্থের দ্বিগুণ প্রাপ্তি তার। অন্যথায় প্রাপ্তিযোগ শূন্য কিংবা প্রাপ্তিযোগ জুয়ার মালিকের।

বোর্ড পেতে এ জাতীয় খেলায় যে জয়লাভ, সেটা সম্পূর্ণ লাকট্রাইয়ের পর্যায়ভুক্ত। ছক্কার ছ'টা পিঠ। তার যে কোনো

একটা পিঠের সঙ্গে জয়লাভের সম্ভাবনা। ফলে সম্ভাবনা ১/৬ মাত্র। তাস খেলাতেও এ রকম একটা সম্ভাবনা থাকে। সেটি অংশগ্রহণ-কারীদের সংখ্যা। খেলায় যদি ১০ জন অংশ নেন, তা হলে প্রত্যেকের জয়লাভের সম্ভাবনা ১/১০। তা ছাড়া তাস খেলায় একটা হিসেব-নিকেশ চলে, তাসের গুণানুসারে যার বিভিন্ন পর্যায়। সেই পর্যায় দেখে নিজের জয়লাভের সম্ভাবনা বিচার।

তাস কিংবা লাক-ট্রাইয়ের যে কোনো খেলায় চালের একটা সার্ব-জনীনতা আছে। সে সার্বজনীনতা চালের বিভিন্নতার সংখ্যা এবং তার সঙ্গে জয়লাভের সম্পর্কের মধ্যে। ছক্কার বেলায় পাতা বোর্ডে ছ'টা ঘর। ছ'বার চাল দিলে সাধারণভাবে এক একবার এক এক ঘরে দান ওঠার কথা। যে ব্যক্তি এ খেলায় অংশ নেবেন, তিনি সে কথা মনে রাখতে পারেন। আর তাসের বেলায় তিন তাসের খেলায় তাসের বিভিন্নতা ২২১০০। অর্থাৎ কোনো একজনের পক্ষে ২২১০০ দান খেললে সবগুলি চাল একবার করে পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই সম্ভাবনা এবং বাস্তব অবস্থা পরস্পরকে ততটা ভরসা দেয় না।

রঙ নিয়ে ধাঁধা

মোটা চালের ভাত আর শাক ডাল চচ্চড়ির মত সাধারণ অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে চাটনি যেরকম আস্বাদের ঝিলিক নিয়ে আসে, তেমনি আমাদের বাঁধা ধরা দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি আর একঘেয়েমির মধ্যে ধাঁধা সে-রকম আনন্দ উচ্ছ্বাস আর বৈচিত্র্যের ঢেউ বহন করে আনে। সব প্রশ্নের সমাধান ধাঁধা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কে এসে পৌঁছে যাবে এমনটি হয় না, হওয়ার আশাও কেউ করে না, খানিকটা অনুশীলন

করে খুঁজে বের করার মধ্যে একটা বাহাদুরির আনন্দ আছে, আর ধাঁধা সে জন্যেও বটে।

কিন্তু চিন্তার কৌলীন্যে এমন ধাঁধার উদ্ভব হয়েছে, যে ধাঁধা শুধু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নয়, সমগ্র গাণিতিক সমাজকে তো বটেই, এমন কি বিজ্ঞান সমাজকেও নাড়া দিয়েছে বলা চলতে পারে।

বীজগণিত, জ্যামিতি, পাটীগণিতের মত টোপোলজি গাণিতিক জগতের আর একটা দিক। নামের আক্ষরিক অর্থ বিষয়কে নির্দেশ করছে ; বিন্দুর বা বস্তুর অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনার উল্লেখ আছে সেখানে। গণিতের বিষয় নিঃসন্দেহে, অথচ তার আর একটা দিকও আছে। সেটা তার ধাঁধার দিক। টোপোলজি তার আদিপর্বে জ্যামিতিক ধাঁধা আর দড়ি সংক্রান্ত নানা খেলার উপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। রাস্তায় রাস্তায় তারের যে অসংখ্য খেলা দেখতে পাওয়া যায়, ছোট ছোট নানা চেহারার, নানা আকৃতির তারের জাল, একটার মধ্য থেকে আর একটাকে কৌশলে বের করবার চেষ্টার ভিতরে আমরা অনেকে অনেক সময়ে বুদ্ধির যাচাই করেছি, সে সব খেলার মূলেও ঐ টোপোলজি কাজ করছে।

কিন্তু টোপোলজির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধাঁধা যা নিয়ে এককালে আলোড়নের ঢেউ উঠেছিল, তা হল ফোর কালার প্রব্লেম (Four Colour Problem)। সমতলের উপরে ম্যাপ আঁকবার সময়ে রংয়ের সংখ্যা সংকোচনের তাগিদে এর উদ্ভব। আর কোথা থেকে কি দাঁড়িয়ে যায়, সে কথা আগে থেকে কে বলতে পারে! অথচ তা নিয়েই সমস্ত গাণিতিক জগতে হৈ চৈ-এর প্লাবন উঠেছে।

আজ একবার রং তুলির বাক্স নিয়ে বসা যাক। সেই রং তুলি নিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে রঞ্জিত করার কথা চিন্তা করি একবার। সাদা কাগজের উপরে পেন্সিলের রেখায় ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকা রয়েছে। উত্তরে হিমালয়, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ভারতবর্ষের মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে, খেয়াল খুশিমতো যে কোনো রং দিয়ে তাকে

আমরা চিহ্নিত করতে পারি। দক্ষিণে সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে, সেখানে মানানসই নীল রং। কিন্তু উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে সাগর মহাসাগর রঞ্জিত করেই উঠে পড়া চলবে না। মাতৃভূমির বাইরের সীমানা চিহ্নিত করার পরে ভিতরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন আছে আমাদের। বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু ছাড়াও বহু ভাষাভাষী আমরা, অনেকগুলি প্রদেশের মধ্যে মোটামুটি তা নির্দিষ্ট আছে। তা ছাড়া কেন্দ্রশাসিত কয়েকটি অঞ্চলও আছে। রং যদি বেশি থাকে, তাহলে আলাদা আলাদা রং দিয়ে এদের প্রত্যেকটিকেই সুস্পষ্ট করে তুলতে পারি।

অসংখ্য রঙে ভারতবর্ষকে রঞ্জিত করায় অসুবিধে নেই, বাধাও নেই কোথাও। কিন্তু রংয়ের সংখ্যা ক্রমশ কমের দিকে নিয়ে এলে কী দাঁড়াবে অনুমান করার চেষ্টা করা যাক একবার। অনেকগুলি প্রদেশ, তা ছাড়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, এ ছাড়া হিমালয়ের জন্য রং দিতে হয়েছে, দক্ষিণে সাগর-মহাসাগরে নীল রং। তবু রংয়ের সংখ্যা কম করলেও ক্ষতি নেই। দূরের দুটি ভিন্ন প্রদেশে এক রং হলে কিছু যায় আসে না, এটা আসল কথা ; আর লক্ষ্য রাখার বিষয়, পাশাপাশি দুটো প্রদেশে এক রং কখনই এসে না পড়ে। এলেই অসুবিধের সৃষ্টি। একই রংয়ের জন্যে দুটো প্রদেশের সীমারেখা মিশে গিয়ে একটা প্রদেশ মনে হতে পারে। সেটা উচিত নয় আর শুধু ধাঁধার খাতিরে নয়, সাধারণ রং করবার নিয়মেই সেটা করা চলবে না কিছুতেই।

পাশাপাশি দুটো প্রদেশে এক রং এসে না পড়ে — এই নিয়মের উপর ভরসা করে সমতল বা গ্লোবের উপরে যে কোনো মানচিত্রকে, সে মানচিত্রটি যত বিভিন্ন অঞ্চল সমন্বিত দেখানোর দরকার হোক না কেন, মাত্র কয়েকটি রংয়ের সাহায্যেই তা চলে। ভারতবর্ষের শুধু সমস্ত প্রদেশকে রংয়ের সাহায্যে আলাদা করে দেখানো নয়, ইচ্ছে করলে, ভারতবর্ষকে ডিভিসান হিসেবে, ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে, এমন কি গ্রামের

সংখ্যা অনেক হওয়া সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি রংয়ের সাহায্য নিয়েই গ্রাম হিসেবে অর্থাৎ গ্রামগুলিকেও আলাদা আলাদা করে দেখানো চলতে পারে।

এ সব ক্ষেত্রে ন্যূনতম রংয়ের সংখ্যা কত হবে, তা নিয়ে, গণিতের একটি বিশিষ্ট বিভাগ, টোপোলজির পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, সমতলের বা গ্লোবের উপরে কোনো ম্যাপকে যত বেশি অংশেই বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর প্রয়োজন হোক না কেন, চারটে রংই যথেষ্ট অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো মানচিত্র, শুধু পৃথিবীর কেন, বাস্তব জগতের মত কল্পনার উপরে ভর করে যে রকম ইচ্ছে মানচিত্র আঁকি না কেন, তাকে খুশিমত যত ভাগে ভাগ করি, চারটে রংয়েই কাজ চলে।

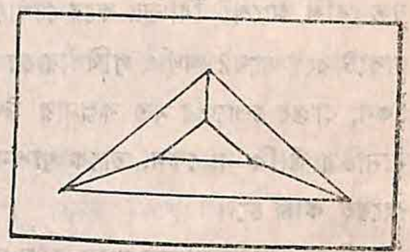
কিন্তু বাস্তবে চারটে রংয়ে কাজ চলে যায় দেখে যে, বিভিন্ন অঞ্চল বিশ্লিষ্ট করে দেখানোর জন্যে যে কোনো মানচিত্রে চারটে রং যথেষ্ট এমন একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হল, এ কথা বলা যায় না। তত্ত্বগত দিক দিয়ে এবং উপপাদ্য হিসেবে গাণিতিকেরা গত ১০০ বছর ধরে এটিকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু অবাক হওয়ার কথা। কেউ পারেন নি। তত্ত্বগত দিক দিয়েও নয় এবং এমন মানচিত্রও কেউ অঙ্কন করতে পারেন নি যাতে চারের চেয়ে বেশি, কমপক্ষে, পাঁচটা রংয়ের প্রয়োজন হচ্ছে। যদি তা সত্যই সম্ভব হত, তা হলে সেই আবিষ্কর্তার নাম গণিতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকত।

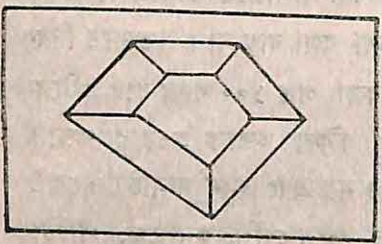
পাঁচটা রং যে যথেষ্ট, গণিতবিদেরা অবশ্য সেটা প্রমাণ করতে পেরেছেন। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তার উর্ধ্বে নয় বা তত্ত্বগত দিক দিয়ে রংয়ের সংখ্যাকে তার চেয়ে আর কমিয়ে আনা যায় নি।

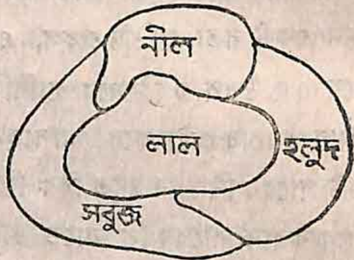
সঙ্গের বৃত্তটিকে লক্ষ্য করি। দশটি অঞ্চলকে মাত্র দুটি রংয়ের সাহায্যে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করে দেখানো গেছে। অথচ অন্য চিত্রগুলিতে চার বা পাঁচটি মাত্র অঞ্চল, তবু চারের কম রংয়ে কাজ চলবে না কিছুতেই। ভারতবর্ষকেও প্রদেশ হিসেবে, জেলা হিসেবে, গ্রাম

হিসেবেও চারটে রং ব্যবহার করেই ভাগ করে দেখানো যায়। এক, দুই, তিন, চার সে যাই হোক না কেন, চারের বেশি রংয়ের দরকার হবে না কোনো সময়েই। কাগজ কলম নিয়ে বসে যদি আঁচড় কাটি, তাহলে, আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক, চারটে রং-ই যথেষ্ট সবক্ষেত্রেই।









অতি সম্প্রতি দুটি দীর্ঘ প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন গণিতবিদেরা। তাতে তাঁরা দেখিয়েছেন, যে কোনো ম্যাপকে রঞ্জিত করে দেখানোর জন্যে চারটে রংই যথেষ্ট। কিন্তু ওই সব প্রমাণ এমনই জটিল যে, ও গুলির সত্যাসত্য যাচাই করে দেখা আজও সম্ভব হয়নি।

বড় সংখ্যার একটা উদাহরণ চাই।

সংখ্যা ছোট হলে কোনো চিন্তাই ছিল না। পাঁচ, দশ, পনেরো, সতেরো বা একশো, দেড়শো, দুশো, পৌনে তিনশো ধরনের একক, দশক, শতক, অঙ্কের কোনো সংখ্যা বলে সহজেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। কিন্তু বড় সংখ্যার বেলায় ভাবনার শেষ নেই। সহস্র ঘরের সংখ্যা বড়, কিন্তু যথেষ্ট বড় নয়। তার উপরে অযুত আছে, লক্ষ আছে, নিযুত আছে দশের গুণিতকে ক্রমান্বয়ে এরা বড় হচ্ছে। নিযুতের উপরে আবার কোটি। নিযুতের বেলায় একের পিঠে ছটা শূন্য, কোটি নিযুতের চেয়ে দশ গুণ বড়। কাজেই আর একটা শূন্য পিছনে বসানোর ফলে একের পিছনে সাতটা শূন্যে কোটি সংখ্যার পূর্ণতা লাভ।

এ যুগেও, এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিজ্ঞানের উন্নতির শীর্ষভাগে অবস্থানের এই গৌরবোজ্জ্বল পর্বেও কোটির উপরের কোনো সংখ্যা ও সংখ্যার নামের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র পরিচয় ঘটেনি এবং পরিচয় ঘটবার অবকাশও মেলেনি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্টের জন্মের আগে, ভারতবর্ষের গাণিতিক পণ্ডিতেরা কোটির উর্ধ্বের অনেক বড় বড় সংখ্যার কল্পনা করেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে বিভিন্ন নামে নির্দিষ্টও করেছিলেন।

প্রাচীন কালে যে সব সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকটির ভিতরে কোটির উর্ধ্বের বড় বড় সংখ্যার বিবিধ পরিচয় আছে।

প্রথমে বাজসনেয়ী সংহিতা থেকে একটি তালিকা উদ্ধৃত করছি।

এক=১, দশ=১০, শত=১০০, সহস্র=১০০০, অযুত=১০,০০০, নিযুত=১০০,০০০, প্রযুত=১,০০০,০০০, অর্বুদ=১০,০০০,-০০০, ন্যর্বুদ=১০০,০০০,০০০, সমুদ্র=১,০০০,০০০,০০০ মধ্য=১০,-০০০,০০০,০০০, অন্ত্য=১০০,০০০,০০০,০০০, পরার্ধ=১,০০০,০০০,-০০০,০০০।

বড় সংখ্যার এই একই তালিকা তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও দেখতে পাওয়া যাবে। মৈত্রায়ণী ও কাঠক সংহিতায় প্রায় একই রকমের সংখ্যার দুটি তালিকা আছে। তবে পূর্বোক্ত তালিকার সঙ্গে তাদের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

মৈত্রায়ণী সংহিতায় অযুতের (১০,০০০) পরে প্রযুত (১০০,০০০), তারপরে আবার অযুত (১,০০০,০০০) তারপর দশ দিয়ে ক্রমান্বয়ে গুণ করে ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত্য ও পরার্ধ। কাঠক সংহিতায় পার্থক্য এতটাও নয়। সেখানে প্রথমোক্ত তালিকার নিযুত এবং প্রযুত শুধু স্থান পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ নিযুতের মান দাঁড়িয়েছে ১,০০০,০০০ এবং প্রযুতকে ১০০,০০০ সংখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা যে যুগের কথা বলছি সে যুগে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে এত বড় বড় সংখ্যা কল্পিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলতে পারে যে, রোমান গণিতে তখন ১০০০ (Mille)-এর উর্ধ্বে এবং গ্রীক গণিতের মত সমৃদ্ধিশালী গণিতেও ১০,০০০ (Myriad) এর উর্ধ্বে কোনো সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়নি। বাজসনেয়ী সংহিতায় যে সংখ্যাটিকে পরার্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে যুগের রোমান বা গ্রীক গণিতের বৃহত্তম সংখ্যার তুলনায় সেটি অনেক গুণ বড়। কত বড়? — যে কোনো হিসেব নিকেশ করতে গেলেই তা বুঝতে পারব।

এক পরার্ধ টাকার কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের এক একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকাতেই নির্দিষ্ট হয়,

তাহলে ২০ টা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ একশো বছরের পরিকল্পনার ব্যয়ভার এই টাকা থেকে অনায়াসে বহন করা চলতে পারে। যদি টাকার কথা বাদ দিয়ে বয়সের কথা ধরি? তাহলেও দেখতে পাব, ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি অধিবাসীর কুড়িগুণ লোককে একশো বছরের পরমায়ু পরার্ধ বয়স থেকে সহজেই ভাগ করে দিতে পারব।

পরার্ধের চেয়েও বড় সংখ্যার কল্পনা হিন্দু গণিতে আছে। সেটি হল অনন্ত। সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে এটির উল্লেখ আছে। আমরা পূর্বে বলেছি, ন্যর্বুদ ১০০,০০০,০০০। তারপরে ক্রমান্বয়ে দশ দিয়ে গুণ করে নিখর্ব সমুদ্র, সলিল, অন্ত্য ও অনন্ত। অনন্তের মান ১০,০০০,০০০,০০০,০০০ ; বাজসনেয়ী সংহিতায় পরার্ধের যে মান বলেছি, তার থেকে দশ গুণ বেশী।

বৈদিক যুগের পরবর্তী অধ্যায়ের একটি বৌদ্ধ গ্রন্থেও এ জাতীয় বড় সংখ্যার পরিচয় আছে — গ্রন্থটির নাম ললিতবিস্তর। দশের গুণিতক হিসেবে সবচেয়ে যে বড় সংখ্যাটি সেখানে লিপিবদ্ধ আছে, তার নাম 'তল্লক্ষণ'। পরার্ধ বা অনন্তের চেয়ে এটি বহুগুণ বড়। পরার্ধে একের পিঠে বারোটা শূন্য, অনন্তে শূন্যের সংখ্যা তেরো, তল্লক্ষণে শূন্যের সংখ্যা বারো তেরোর কাছাকাছি কোথাও নেই। একের পিঠে তিপ্পান্নটি শূন্য — সেই হল তল্লক্ষণের সংজ্ঞা।

কিন্তু সে যুগের বড় সংখ্যার কল্পনায় তল্লক্ষণই সর্ববৃহৎ নয় — আরও একটি সংখ্যার কথা বলতে হবে, যেটির নাম শীর্ষপ্রহেলিকা। পরার্ধের তুলনায় যেমন তল্লক্ষণ বড় তেমনি তল্লক্ষণের তুলনায় শীর্ষপ্রহেলিকা আরও অনেক, অনেক বড়। চুরাশি লক্ষকে (৮,৪০০,০০০) চুরাশি লক্ষ দিয়ে ক্রমান্বয়ে আঠাশবার গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, সেটিই শীর্ষপ্রহেলিকা। অঙ্কে একে লিখতে গেলে ১৯৪টি অঙ্কস্থানের প্রয়োজন। ভেবে দেখা যাক, অবস্থাটা একবার। পাঁচ, সাত, দশ অঙ্কস্থান বিশিষ্ট সংখ্যাই আমাদের কাছে যথেষ্ট

বড, সেখানে ১৯৪ অঙ্ক স্থান জুড়ে যে শীর্ষপ্রহেলিকা তার তো কথাই নেই।

খ্রীষ্টের অনেক পরবর্তী যুগের শ্রীধর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য, মহাবীর, নারায়ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় গাণিতিকেরাও, তল্লক্ষণ বা শীর্ষ-প্রহেলিকার মত সুবৃহৎ না হলেও, তাঁদের পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে, মোটামুটি বড় সংখ্যার কথা চিন্তা করেছেন।

শ্রীধরাচার্য, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও নারায়ণের চিন্তায় সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল পরার্ধ। সংখ্যায় সে একের পিঠে সতেরোটা শূন্য! বৈদিক যুগে আমরা কিন্তু পরার্ধের অন্য রূপ দেখেছি। বাজসনেয়ী বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় পরার্ধ একের পিঠে তেরোটা শূন্য। পরবর্তী যুগে পরার্ধের শূন্যের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। এবং তেরো ছাড়িয়ে পরার্ধের শূন্যর সংখ্যা বেড়ে সতেরোয় গিয়ে পৌঁছোয়।

মহাবীরের কল্পনায় পরার্ধ বলে কিছু ছিল না। তিনি সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটি কল্পনা করেছেন — সেটির নাম মহাক্ষোভ। একের পিঠে তেইশটি শূন্যে সে পূর্ণতা পেয়েছে।

পরার্ধ, তল্লক্ষণ, অনন্ত, শীর্ষপ্রহেলিকা বা মহাক্ষোভের মত সুবৃহৎ সংখ্যার কল্পনা — এ শুধু এ দেশের গাণিতিকদের অবসর সময়ের বিলাস নয়, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ করে গেছেন যে, বাস্তবে, নানা কাজে-কর্মে এ সব সংখ্যার ব্যবহার হত। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য তাঁর লীলাবতী গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতের গাণিতিকেরা দশের ভিত্তিতে বড় বড় সংখ্যা নানা কাজে ব্যবহারের জন্যে স্থির করেন।

সে যুগে বড় সংখ্যার বাস্তবে প্রয়োগ বিস্ময়কর। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ, বিজ্ঞানের ভাবাদর্শে পুষ্ট, কিন্তু কাজ-কর্মে বড় সংখ্যা ব্যবহারের আজও দরকার পড়ে না।

অদ্ভুত ছক

১৬	৩	২	১৩
৫	১০	১১	৮
৯	৬	৭	১২
৪	১৫	১৪	১

এ হচ্ছে অদ্ভুত ছক। কে যে আবিষ্কার করেন বলা কঠিন। কিন্তু ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি খোদাইয়ে এটি প্রথম নজরে আসে।

এর প্রত্যেকটি সারির যোগফল কত?

আশ্চর্য, সব সারিতেই ৩৪। প্রত্যেকটি স্তম্ভের সংখ্যার যোগফল, তাও ৩৪। কোণাকুণি দুটি সারির, সেখানেও ৩৪।

এ ছাড়া আরও আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সারির প্রত্যেকটি সংখ্যার বর্গের যোগফল, তৃতীয় ও চতুর্থ সারির সব সংখ্যার বর্গের যোগফলের সমান, সে যোগফল ৭৪৮। আর সারির বেলায় যা সত্যি, স্তম্ভের সংখ্যার বর্গের বেলাতেও তাই। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের সব সংখ্যার বর্গের যোগফল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের সব সংখ্যার বর্গের যোগফলের সমান, আর তারও মান ৭৪৮।

এই অদ্ভুত ছকের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবার মত। এবার প্রথম ও তৃতীয় সারির সংখ্যার বর্গের যোগফল, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সারির সংখ্যার বর্গের যোগফলের সমান।

সারির মতন স্তম্ভের বেলাতেও।

তা ছাড়া কৌণিক দুই সারির সংখ্যার যোগফল, কৌণিক নয়

এমন সংখ্যার যোগফলের সমান। সংখ্যাগুলির বর্গের বেলাতেও তাই। আরও আশ্চর্যের কথা! সংখ্যাগুলির ঘনের বেলাতেও যোগফল সমান।

কী ভাবে এই বিচিত্র ছক নির্মিত হয়?

খুব সহজ এই ছক নির্মাণ করা।

ছকে ১৬টি ঘর। ১৬টি ঘরের জন্য ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ১৬টি অঙ্ক। এখন ১৬ কে নিয়েই ছক তৈরী শুরু। আগে ১৬ কে বসানো হল প্রথম সারির বাঁ দিকের ঘরে! তারপর ১ কমাতে কমাতে সংখ্যা বসানো—সব ঘরে নয়—শুধু দুটি কৌণিক রেখার ঘরগুলিতে:

১৬			১৩
	১১	১০	
	৭	৬	
৪			১

এবার ১ থেকে শুরু করে ১৬ পর্যন্ত সংখ্যা বসানো। প্রথম সারির বাঁ দিকের ঘর থেকে শেষ সারির ডান দিকের ঘর অব্দি। যে যে ঘর ভর্তি সেই সেই ঘর বাদ। তাহলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায়:

১৬	২	৩	১৩
৫	১১	১০	৮
৯	৭	৬	১২
৪	১৪	১৫	১

এই হল ছকটি। কিন্তু এখনও পুরোপুরি মেলেনি।

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এটির অঙ্কনের সাল তারিখ তুলে ধরবার জন্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তম্ভকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে আসল ছকটির পরিচিত রূপ:

১৬	৩	২	১৩
৫	১০	১১	৮
৯	৬	৭	১২
৪	১৫	১৪	১

ধাঁধার রকমফের

অজানার দিকে মানুষের স্বভাবতই একটা আকর্ষণ আছে। সকল দেশের, সকল মানুষের সে আকর্ষণ চিরকালের। তারই টানে মানুষ এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছে, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুতে অভিযান চালিয়েছে, মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, চন্দ্রে পাড়ি দিয়েছে। অজানাকে জানবার কৌতূহল মানুষের অনন্তকালের ধর্ম। রাস্তায় বেদেরা যখন ভোজবাজি দেখায় তখন সেই ধর্মেরই তাগিদে, ভোজবাজির আসল চালাকিটুকু, মূল কৌশলটুকু ধরবার জন্যে আমরা ভীড় জমাই। অজানা রহস্যকে উন্মোচন করবার একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ধাঁধার বেলাও সে রকম। সেখানেও সেই অজানাকে জানবার চেষ্টা। সাধারণ মানুষ আমরা। আমাদের জীবনে অজানাকে জানবার জন্যে বড় বড় অভিযানের সুযোগ কম। কখনও কখনও রাস্তায়, ভীড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে উঁকিঝুঁকি মারি বটে ম্যাজিক দেখবার জন্যে, সেই অজানাকে জানবার চেষ্টায়, কিন্তু তাও বেশী ঘটে না। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো পরিবেশে, কী ঘন বর্ষার রাতে, কী দুপুরের গুমোট হাওয়ায়, কী ছোটদের আসর জমাতে, কী বড়দের মনকে নাড়া দিতে, বলতে গেলে, সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে সকল সময়ের জন্যে আনন্দ দিতে ধাঁধা যে রকম সার্বজনীন হবার স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমন আর কিছুই নয়।

বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন জীবিকার, বিভিন্ন বয়সের জন্যে ভিন্ন ধরণের ধাঁধা আছে। সব দেশের, সব জাতের ছোটরা যে ধাঁধায় আনন্দ পাবে, দিদিমা ঠাকুমা পিসিমার জন্যে সে ধাঁধা কখনই নয়, তাঁদের জন্যে আলাদা।

এক চিলের দুটো পা হলে চার্চিলের কটা পা? বহু প্রচলিত এ

ধাঁধা ছোটদের। কোন্ টেবিলের পা নেই? খাওয়ার টেবিল বা পড়বার টেবিল নয় — পায়াবিহীন টেবিলই হয় না। তবে কী? চট্ করে টাইমটেবিল মনে পড়লে বাহাদুরির কথা। ছোটদের পক্ষে তো বটেই। কিংবা কোন্ বাচ্চা কাঁদে না? শিশুমাত্রেই কাঁদে। একেবারে কাঁদে না এমনটি দেখা যায় না। তবে কোন্ বাচ্চা কাঁদে না কেমন করে হবে? উত্তর পারম্পর্যবিহীন অনেক দূরের শব্দ চৌবাচ্চা—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়া শিশুদের কাছে বিস্ময়কর বৈকি।

শিশুদের এ জাতীয় ধাঁধার গণ্ডীর উপরে উঠে আত্মীয়দের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আর এক জাতীয় ধাঁধার প্রচলন আছে। ধাঁধার উপস্থাপনাও সুন্দর।

পুকুরের দু ঘাটে দুই বউ কলসীতে জল ভরছে। এ-ঘাটের বউ বলছে, তোর শ্বশুর মোর শ্বশুরের শ্বশুর হয়। — উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী?

যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য পরিবেশনার ঊর্ধ্বে উঠে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ধাঁধাটি নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছে:

হ্যালো, এটা কী 963249।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, 963249। আপনি কে বলছেন?

আরে, আরে, গলা শুনে বুঝতে পারলে না? তুমি তো কমলা বলছো?

হ্যাঁ, কমলাই বলছি। আপনি?

আরে, আমাদের মধ্যে এ রকম আত্মীয়তা তবু চিনতে পারলে না আমাকে? কী জানো, তোমার শ্বশুর আমার শ্বশুরের শ্বশুর হয়। বুঝলে তো এবার?

বটে? বটে? তা হলে তো তুমি আমার···।

এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার যে লাইন গেল কেটে।

তবু দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কী, একবার চেষ্টা করা যাক বের করবার।

সম্পর্ক নিয়ে অসংখ্য ধাঁধার মধ্যে আর একটি ধাঁধার উল্লেখ করছি। দুই বাপ আর দুই ছেলে গ্রাম ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেল। তাতে শহরের লোকসংখ্যা যা ছিল তা থেকে মাত্র তিনজন কমল। কী করে হয়? বাপ, ছেলে আর নাতী — এই তিন জনেই দুই বাপ আর দুই ছেলে। আর সেইটুকু নিয়েই মনে ধাঁধা লাগানো।

বিচিত্র এই ধাঁধার গুণ, বহুমুখী তার গতি। তার প্রভাবে আশ্চর্য ফলাফল চতুর্দিকে। সে যেমন সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারে তেমনি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।

তিন বন্ধু রেস্তোরাঁয় গেছে। খিদে পেয়েছিল প্রচুর, পেট ভরে খেল সকলে। ওয়েটার বিল নিয়ে এল। ৩০ টাকা। তিন বন্ধু। ১০ টাকার নোট প্রত্যেকে বের করে দিলে। এখন দোকানে নিয়ম ছিল ৩০ টাকার খেলে ৫ টাকার ডিসকাউণ্ট দেয়। ওয়েটার ৫ টাকা ফেরৎ নিয়ে এল। কিন্তু পাঁচটা টাকাই তুলে নেওয়া ভাল দেখায় না। ওয়েটার সার্ভ করেছে, তাকে কিছু দেওয়া দরকার। তাকে দুটো টাকা দিয়ে তিনজনে প্রত্যেকে এক টাকা করে তুলে নিল। তা হলে প্রত্যেকের খরচ হল কত? দশ টাকা করে দিয়েছিল। এক টাকা ফেরৎ পেল। অর্থাৎ প্রত্যেকের খরচ হল ৯ টাকা। তিন জনের ২৭ টাকা। আর বেয়ারা ২ টাকা। সবশুদ্ধ ২৯ টাকা। বাকি এক টাকা কোথায় যাচ্ছে?

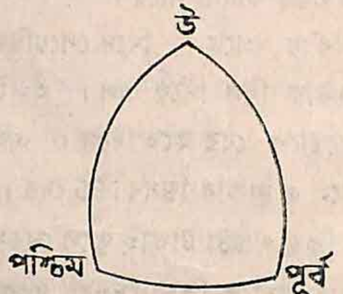
গণিতে এ জাতীয় আরও অসংখ্য ধাঁধা আছে। পাটীগণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে সে সবের কিছু বীজগণিতের সাহায্যে, কিছু বা জ্যামিতির সাহায্যে সমাধান করার দরকার হয়।

ভূগোলকে ভিত্তি করেও সুন্দর সুন্দর ধাঁধার প্রচলন আছে।

এক শিকারী অনেক দেশে শিকার করে এসে এক জায়গায় তাঁবু ফেলল। সেই তাঁবু থেকে শিকারী শিকার করতে বেরোল; দক্ষিণ দিকে গেল দশ মাইল, কিছু পেলে না, তখন পূর্ব দিকে গেল দশ

মাইল, সেখানে একটা ভালুক দেখল। সেই ভালুকটা শিকার করে আবার উত্তর দিকে এল দশ মাইল। আর এই দশ মাইল আসবার পরেই সে তার তাঁবু পেয়ে গেল। তা ভালুকটার কী রং ছিল?

খুব অবাক করবার মত প্রশ্ন। প্রথম ধাক্কাতে একেবারে অসম্ভব মনে হয়। আসলে তা নয়। যাতায়াতের বিষয়টা তলিয়ে দেখলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আসবে। পূর্বদিকে দশ মাইল এসে ভালুক শিকার করবার পরে সে উত্তর দিকে যাচ্ছে দশ মাইল। সাধারণ ছবি আঁকলেই বোঝা যাবে যে, পশ্চিমে আরও দশ মাইল না গেলে তাঁবু



পাওয়ার কথা নয়। তবু পশ্চিম দিকে সেই দশ মাইল না গিয়েই সে তাঁবু পাচ্ছে। প্রশ্নের আসল কায়দা সেখানেই। উত্তরও সেখানেই। পৃথিবীর ভৌগোলিক আকৃতির জন্যে এমন একজায়গা হল উত্তর মেরু, সেখান থেকে দক্ষিণে দশ মাইল গিয়ে পূর্বে দশ মাইল এসে আবার উত্তরে দশ মাইল গেলে তাঁবু ফিরে পাওয়া যায়। আর উত্তর মেরু ঠাণ্ডার দেশ, সেখানে ভালুকের রং স্বভাবতই সাদা।

ইতিহাসও ধাঁধার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

একটি মুদ্রার সাল তারিখ ২১৫ বি সি। একজন বিশেষজ্ঞ দেখে বললেন, মুদ্রাটি জাল। কীভাবে তিনি বললেন?

বিশেষজ্ঞের দরকার নেই, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন সকলের জন্য এ ধাঁধা। যে কেউ সামান্য চিন্তা করলেই এর উত্তর দিতে পারবে।

শুধু ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি নয়,

বিজ্ঞানের আরও অসংখ্য বিভাগকে কেন্দ্র করে আরও বহুবিধ ধাঁধা গড়ে উঠেছে।

ম্যাথ্‌মেটিক্যাল লজিক আজকাল গণিতের একটি বহু আলোচিত বিষয়। ছোটদের বিখ্যাত গ্রন্থ অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড রচয়িতা লিউইস ক্যারোল এ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। ম্যাথ্‌মেটিক্যাল লজিক-এর উপরে তাঁর কিছু বিখ্যাত ধাঁধা আছে। তার মধ্যে একটি ধাঁধা অনেকটা এই জাতীয়ঃ

একটি ঘড়ি এক ঘণ্টায় এক মিনিট স্লো যায়। আর একটি ঘড়ি একেবারেই চলে না। যে ঘড়ি ঘণ্টায় এক মিনিট স্লো যায়, সে ঘড়ি ছুমাসে একবার মাত্র ঠিক সময় দেয়। আর যে ঘড়িটা একেবারেই চলে না, তার অবস্থাটা কী রকম? ধরা যাক, সে ঘড়িতে ছটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়ে আছে। তবুও সেই ঘড়িতে দিনে ছু-বার ঠিক সময় দেবে। সকাল ছটা পঁচিশ মিনিটে একবার আর সন্ধে ছটা পঁচিশ মিনিটে একবার। তা হলে কোন্ ঘড়িটা বেশি কাজের?

নদী পারাপার সংক্রান্ত ধাঁধাগুলি ধাঁধার জগতে অতি প্রাচীন এবং অতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ছুই ভায়রাভাই সস্ত্রীক নদীর ঘাটে এসেছে। ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। মাঝিটাঝি নেই। তা নাই থাক। ধাঁধার ভায়রাভাইদের মেজাজ ভাল, দাঁড় টানায় আপত্তি নেই তাদের। কিন্তু অসুবিধে নৌকো আর ছুটি বোনকে নিয়ে। ছোটো নৌকো, ছুজনের বেশী চাপবার ভরসা হয় না, আর ছুই বোন কী হিংসুটে, নিজের নিজের কর্তাকে সঙ্গে না নিয়ে পার হতে রাজী নয় কিছুতেই। তবু ওপারে যেতে হবে সবাইকে।

বয়সের ধাঁধা, গণিতে শূন্যস্থান পূরণ সংক্রান্ত ধাঁধা, বলের ধাঁধা, বয়সের ধাঁধা, শব্দের ধাঁধা, বুদ্ধির ধাঁধা ছাড়াও আরও বহুবিধ, বহু বিচিত্র, বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য ধাঁধা আছে।

পশুপক্ষীর গণিত শিক্ষা

পড়ুয়া বেড়ালছানা নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের এক কল্পনাপ্রবণ শিশুর প্রাণী-জগতে একদিন 'কানাইমাস্টার' সাজবার যে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে—পাঠক হিসেবে তাকে চিরকাল আমরা কল্পলোকের চতুঃসীমার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু বাস্তব জগতে সত্যি সত্যিই শিক্ষার্থী পশুপক্ষীদের একাধিক বিস্ময়কর কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

কথাটা শুনে অবাক হতে হয়। কী ভাবে সম্ভব তা? পশুপক্ষীদের অক্ষর পরিচয় নেই। তারা অ আ ক খ বলতে পারে না, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ চিনতে পারে না, তাদের কেউ ডাকে কিচির মিচির করে, কেউ ডাকে আম্বা আম্বা রবে, কেউ ডাকে ঘেউ ঘেউ স্বরে। লেখাপড়া তাদের শেখানো যাবে কী উপায়ে?

উপায়ের অন্ত নেই। ভালো পড়ুয়া হলে দুরূহ বিষয়কেও সহজেই জল করে দেওয়া চলে। প্রাণীজগতে একাধিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পড়ুয়া দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়ার যোগ্যতা যারা রাখে তারা হল কুকুর আর ঘোড়া। আজ এখানে এদের শিক্ষালাভের কথা আলোচনা করব।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল নিয়ে শিক্ষণীয় অসংখ্য বিষয় আছে। কিন্তু সব বিষয় সকলের পক্ষে রুচিকর নয়। প্রাণী-শিক্ষকেরা এই সব বিষয়ের মধ্যে গণিতকে প্রাণীশিক্ষার ক্ষেত্রে সব চেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করেছেন।

এমনিতেই প্রাণীজগতের অধস্তন পশুপক্ষীদেরও গণিতের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা আছে।

দিনের শেষে পরিচিত চড়ুই কর্তাগিন্নী বাসায় ফিরে আসে। সকালে বাসা ছাড়বার সময়ে, মনে করা যাক, খড়ের বাসায় ছিল চারটে

ডিম। বিকেলে বাসায় ফিরে তারা স্বাভাবিকভাবেই আবার ডিমের হিসেব নেওয়ার চেষ্টা করবে। কীভাবে করবে? আঙুল গুণে গুণে? না, তা নয়। তবে, নাম ধরে ধরে? না, তাও নয়। তবে? সহজাত গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কীয় ধারণা গুণে।

কিন্তু এ ধারণা সুস্পষ্ট নয়। কাজেই চারটে ডিমের ভেতর থেকে কেউ যদি কায়দা করে একটা ডিম সরিয়ে রাখে, তা হলে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয় না। দু'টো ডিম সরালে কিন্তু আর উপায় নেই। চড়ুই অবস্থাটা বুঝতে পারে এবং বাসা বদলানোর জন্যে সচেষ্ট হয়। প্রাণীজগতের অধস্তন পশুপাখীদের সংখ্যার এ জাতীয় ধারণা উর্ধ্বতন মহলে আরও গভীর ও উজ্জ্বল। তাই উর্ধ্বতন মহলে লেখাপড়া শেখানো সংশয়হীনভাবে সহজ। আর কুকুর ঘোড়া হল উর্ধ্বতন মহলের ফার্স্ট সেকেণ্ড বয়। তাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই!

বিংশ শতাব্দীতে গাণিতিক সংখ্যাভিত্তিক শিক্ষা-প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায় বার্লিন শহরে। সে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার কথা। বার্লিনের উইলহেম ওস্টেন নামক জনৈক ব্যক্তি হ্যান্স নামে একটি ঘোড়াকে নিয়ে মাস্টারি সুরু করেন। প্রথমে তিনি ডাইনে বাঁয়ে, উপর নীচে এই জাতীয় নির্দেশের সঙ্গে হ্যান্সের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেন— শিক্ষার এটাই প্রথম পাঠ। সে পাঠ সহজেই সার্থক। অতঃপর দ্বিতীয় পাঠে পা বাড়ানো।

হ্যান্সকে একটি টেবিলের সামনে আনা হল। ফাঁকা টেবিল, তার উপরে একটা পিন রাখা হল। ওস্টেন জোরে জোরে বললেন 'এক'। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গোড়ালিটি তুলে একবার মাটির উপরে আঘাত করালেন। পরে একটা পিনের বদলে দুটো পিন রাখলেন। মুখে বললেন 'দুই' আর সেই সঙ্গে ঘোড়ার গোড়ালি দিয়ে মাটিতে দুবার আঘাত হানলেন। পড়াশুনো এগোতে লাগল। এক, দুই থেকে নয় পর্যন্ত। আশ্চর্য দ্রুত এবং বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করতে লাগলেন

উইলহেম ওস্টেন। পিনগুলি সরিয়ে নেওয়া হল — এবারে অক্ষর পরিচয় পালা। সংখ্যাগুলি একের পর এক ব্লাকবোর্ডে লেখা হল। প্রথমে এক, কিন্তু ঘোড়া 'এক' চিনবে কী করে? অসুবিধে নেই কিছু। একটি পিন দেখিয়ে ঘোড়াকে 'এক' সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছিল — সে ধারণার স্বীকৃতি একবার গোড়ালি ঠোকা। এবারেও একবার গোড়ালি ঠুকিয়েই হ্যান্সকে 'এক' অঙ্কের চেহারাটি চেনানো হল — এবং এ চেহারা কী অর্থ বহন করে তাও সে বুঝতে পারল। এইভাবে বাকি অঙ্কের বেলাতেও সাফল্য নজরে এল। ফলে ঘোড়ার গোড়ালির আঘাতেই ক্রমে ক্রমে সংখ্যা পরিচয়ের ও চেনার জ্ঞান সম্পূর্ণ হল।

এ সাফল্যে ওস্টেন খুশী হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে গেল। তিনি সোজা সোজা অঙ্ক নিয়ে হ্যান্সকে যোগ বিয়োগ শেখাবার চেষ্টা করলেন। যে জীব সংখ্যা চিনবার শক্তি রাখে সে জীব সাধারণ যোগ বিয়োগ পারবে না কেন? হ্যান্স পেরেছিল। আর শুধু এই পারা নয়, তার মেধার গুণে তার সাফল্যের পরিধি বিস্তৃততর হয়েছিল — যে কোনো দিনের তারিখ জানলে পরের দিনগুলির তারিখ বলে দেওয়ার ক্ষমতা সে সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করেছিল।

হ্যান্সের এই বহু বিচিত্র পারদর্শিতার কথা পশু-মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কানে উঠেছিল। তার ফল হিসেবে পরিপূর্ণ তদন্তের জন্যে একটি কমিটি গঠিত হল। বিশিষ্ট ব্যক্তিসম্পন্ন কমিটি। বার্লিন ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির প্রোফেসর হেয়ার স্ট্র্যাম্পফ, ফিজিওলজির প্রোফেসর হেয়ার ন্যাগেল; তা ছাড়া জুওলজিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর, সার্কাসের একজন ম্যানেজার, পশু চিকিৎসক ও পদাতিক বাহিনীর অফিসাররা। তাঁরা ঘোড়ার গাণিতিক নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলেন। কিন্তু কারণ খুঁজে পেলেন না। একবার মনে হল, ওস্টেনের উপস্থিতিতে হ্যান্স-ওস্টেনের মধ্যে কোনো গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সে কারণে তাঁরা সতর্ক হলেন এবং

ওস্টেনকে পরীক্ষার হলের বাইরে যেতে বললেন। তবু দেখা গেল শিক্ষকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াও হ্যান্সের গাণিতিক পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

হ্যান্সের এই কৃতিত্বে ও শিক্ষক ওস্টেনের গৌরবে আরও অনেকে উৎসাহিত হলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা এক ধনী ব্যবসায়ী কার্ল ক্রলের। ১৯০৯ খ্রষ্টাব্দে ওস্টেনের মৃত্যুর সময় তিনি হ্যান্সকে সংগ্রহ করলেন এবং সেই সঙ্গে আরও দুটি ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে এলেন।

তারপরে সুরু হল শিক্ষা—প্রতিটি ঘোড়ার পিছনে রোজ দেড় ঘণ্টা থেকে দু ঘণ্টা পর্যন্ত সময়ে, এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার পরিচয় এবং সংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা দেবার পরে শূন্যের সাহায্যে দশ এবং দশের গুণিতকের ব্যবহার বোঝানো হল। পূর্বের মত এ ক্ষেত্রেও অতি দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল। আর সেই সঙ্গে এও দেখা গেল যে, পুরোনো পড়ুয়া হ্যান্সের পারদর্শিতাকে ম্লান করে দিয়ে নতুন ছাত্রেরা গাণিতিক চিন্তায় অনেক বেশি ব্যুৎপত্তি দেখাল। তার মধ্যে একটির তৎপরতা আশ্চর্যজনক।

ছোট ছোট যোগ বিয়োগের কথা বাদ দিই। বড় বড় যোগ বিয়োগও ঘোড়াটির আটকাতো না। তা ছাড়া সে যুক্ত চিহ্নের (+) এবং বিযুক্ত চিহ্নেরও (−) মানে বুঝতো। কিন্তু এ সবের থেকেও সব চেয়ে বড় সাফল্য তার ছিল বর্গমূল এবং ঘনমূলের বেলায়।

জেনোয়ার প্রোফেসার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জী একদিন এলেন কার্ল ক্রলের কাছে। একটির কৃতিত্বের কথা তিনি শুনেছেন। তাকে তিনি পরীক্ষা করবেন। সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ নয়। ম্যাকেঞ্জী সাহেব ১৮৭৪১৬১-এর বর্গমূল বের করতে দিলেন তাকে। পায়ের গোড়ালি ঠুকে সে উত্তর দিল ১৩৬৯। নির্ভুল উত্তর। এলেন কোলনের ডঃ হার্টকোফ। তিনি দিলেন ঘনমূলের অঙ্ক। গাণিতিক

9746

সংকেতে বোর্ডে লেখা হল তিনটি অঙ্ক। প্রথমটি ঃ ১৩,৮২৪—এর ঘনমূল কত? দ্বিতীয়টি ঃ ২৯,৭৯১—এর ঘনমূল কত? তৃতীয়টি ঃ ১০৩,৮২৩—এর ঘনমূল কত? প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর সে একেবারেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বলতে পারল। তৃতীয় উত্তরের বেলায় কেন কে জানে সে প্রথমে গোলমাল করল। বললে ৫৭। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে শুধরে নিল। গোড়ালির আঘাতে জানিয়ে দিল ১০৩,৮২৩ এর বর্গমূল ৫৭ নয়, ৪৭। তারপরে ফোর্থ রুট নিয়েও পরীক্ষা চলল। এলেন আর একজন বিজ্ঞানী ডঃ হ্যানেল। জিগেস করলেন ৭,৮৯০,৪৮১ এর ফোর্থ রুট কত?

কী আশ্চর্য! যে প্রশ্নের উত্তর আমরা লেখাপড়া শেখা মানুষেরা মুখে মুখে দিতে পারি না, সে প্রশ্নের উত্তর একটা অবলা চতুষ্পদ জীব কীভাবে গোড়ালি ঠুকে নির্ভুলভাবে বলে দিল ভাববার কথা। ঘোড়াটি উত্তর দিল ৫৩।

সে যাই হোক, এখন এ কথা মানতে হবে যে, এ সাফল্য অভাবনীয় সাফল্য। সুতরাং এর প্রভাব অন্যান্য জন্তুদের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। কুকুর হাতী এমন কি বেড়াল ছানা নিয়েও শিক্ষা চলতে লাগল। কিন্তু কুকুরে যা ভেল্কি দেখাল তার তুলনা মেলা ভার। আগে জার্মানীর ম্যানহেমে, ফ্রাও মোকেল ও তাঁর পোষা কুকুর রোল্‌ফের কথা, ফ্রাও মোকেলের নিজের ভাষায় শোনা যাক।

রোজ দুপুরে ছোট ছেলেটাকে অঙ্ক কষাই। পাশে রোলফ্ লেজ গুটিয়ে বসে থাকে। বর্ণ পরিচয় শেষ হয়েছে, অঙ্কের সংখ্যাও ছেলে চিনেছে। ছোট ছোট যোগও সে করতে পারে। কিন্তু সেদিন মুস্কিল হল ১২২ + ২ এর বেলায়। কিছুতেই সে বলতে পারে না। আমিও সেরকম। কিছুতেই তাকে ছাড়ব না। শেষকালে যখন কিছুতেই কিছু নয়, তখন আমি আর রাগ সামলাতে না পেরে মারলুম ছেলেটাকে এক চড়। এমন সময় রোলফ্ উঠে দাঁড়াল। রোলফের

দিকে নজর পড়তে আমি বললাম, রোলফ্, তুমি বলতে পারবে? বলতো, ২+২ কত হয়? সে ডান পায়ের থাবায় আমার হাতে চারবার আঘাত করল। আমি উৎসাহিত হলাম। জিগেস করলাম, বল, ৫+৫ কত হয় সে আবার সঠিক জবাব দিল।

এখানেই এ আখ্যানের পরিসমাপ্তি। ছেলের শিক্ষার কথা মোকেল আর কিছু বলেন নি, কিন্তু আমার ধারণা ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে মোকেল রোল্ফের শিক্ষা নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে রোল্ফ্ দুরূহ ঘনমূলের সরল পর্যন্ত করে দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। তা ছাড়া মজার মজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে আগন্তুকদের আনন্দ পর্যন্ত দিতে পারতো। গাছে কটা ফুল ফুটেছে? কটা ফুল লাল? টেবিলে কটা ফল? এ সব প্রশ্নে সে কখনও উদ্বেগ বোধ করত না।

রোলফ্ ছাড়াও প্যারিসের কুকুর জাও তার নৈপুণ্য ও স্বকীয়তায় শিক্ষিত পশুদের জগতে তার নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ক্যারিটা বোরদেরিক্র্ নামে প্যারিসের এক শিক্ষিতা মহিলার পোষা কুকুর ছিল জাও। ১৯২৫ সালের ২৮ মার্চ, হঠাৎ মহিলার খেয়াল চাপল জাওকে লেখাপড়া শেখাবেন। জাওয়ের বয়স তখন সবে চোদ্দ মাস, তবু মহিলাটি তাকে নিয়ে বসলেন। খাওয়ার টেবিলে প্রথম পাঠ। জাও যে কেক খেতে ভালবাসে সে কেক টেবিলের উপরে এক প্লেট বসানো ছিল — হয়তো বা লোভ দেখিয়ে পড়ানোর জন্যে। মহিলাটি মুখে বললেন, 'এক' — সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের একটি আঙুল দেখালেন। জাও তার সামনের ডান পায়ের থাবা একবার মহিলার হাতে রাখল। এইভাবে দুই, তিন থেকে সুরু করে বাকি সংখ্যাগুলির অর্থও বোঝানো গেল। তারপরে ক্যালেণ্ডারের অঙ্ক দেখিয়ে পূর্বোক্ত এক দুই তিনের ধারণা মিলিয়ে সংখ্যাগুলিও চেনানো হল। পড়াশুনো এগোতে লাগল। ক্রমে ক্রমে যোগ বিয়োগের সঙ্গেও জাওয়ের পরিচয় ঘটল। ফল হিসেবে জাও অনেক মজার মজার প্রশ্নের

উত্তর দিয়ে সবাইকে আনন্দ দিত। ঘরে কত লোক আছে? ২ আর ৫-এ কত হয়? ৯ থেকে ৩ বাদ দিলে কী দাঁড়ায়?

পশুজগতে এ জাতীয় গণিত শিক্ষার অনেক বিস্তৃত বিবরণ আছে। সে শিক্ষার বিবরণে মোটামুটিভাবে এটুকু লক্ষ্য করা গেছে যে, সে শিক্ষা বিশেষ দুরূহ নয়।

কায়দা করে খাওয়ার ধাঁধা

একটা সোনার চেন — তাতে আছে সাতটা আংটা। প্রত্যেকটা আংটাই হোটেলে একদিন খাওয়ার খরচা।

এখন হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা। ধারে নয়। রোজ খাওয়া— বিনিময়ে সোনার চেনের একটা আংটা, রোজ দেওয়া।

সোনার চেনটাকে সবচেয়ে কম কতগুলো টুকরোয় কাটলে রোজ একটা করে আংটা দেওয়া চলে?



শুনলে অবাক হওয়ার কথা, মাত্র একটা আংটা কেটেই ধাঁধার রহস্য ভেদ করা সম্ভব।

যদি তৃতীয় আংটাটা কাটা হয়, তাহলে প্রথম দুটো এক সঙ্গে থাকে, তৃতীয়টা আলাদা, বাকি চারটে, চতুর্থ থেকে সপ্তম পর্যন্ত একসঙ্গে।

প্রথম দিন খাওয়ার পরে একটা আংটা, সেটা তৃতীয় আংটা, জমা দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম দুটি দিয়ে তৃতীয়টি ফেরৎ নেওয়া, তৃতীয় দিনে প্রথম দুটির সঙ্গে তৃতীয়টি দেওয়া, চতুর্থ দিনে প্রথম দুটো আর তৃতীয়টা ফিরিয়ে নিয়ে শুধু শেষের চারটে দেওয়া, পঞ্চম দিনে চারটের সঙ্গে তৃতীয়টা, ষষ্ঠ দিনে তৃতীয় আংটা ফেরৎ নিয়ে শেষ চারটের সঙ্গে প্রথম দুটো আর সপ্তম দিনে আর একটা দিয়ে সর্তরক্ষা।